বিমানের নতুন দাদা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিমানের নতুন দাদা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হারাধন ভদ্রলোক হতে চায়

ছিদাম চাষার কথা বলছি।

ছিদামকে চাষা বললুম বটে, কিন্তু সে সাধারণ চাষা নয়। একদিক দিয়ে তাকে ধনী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ছিদামের বাপ ছকড়ি আমরণ জমিতে লাঙল চালনা করেছিল, এবং ছিদামকেও তার বাপের মৃত্যু পর্যন্ত যে লাঙল চালাতে হয়েছিল, একথা সকলেই জানে।

কিন্তু বাপ মারা যাওয়ার পর ছিদাম যখন দেখলে, সে কয়েক-শত-বিঘা-ব্যাপী চাষজমির মালিক, আর তার অধীনে কাজ করছে অগুনতি লোক, তখন সে নিজে হাতে-নাতে কাজ করা ছেড়ে দিলে। অবশ্য তার নিজের চাল-চলন কিছুই বদলাল না। প্রতিদিন সে নিজের চাষ-জমিতে হাজির থেকে সমস্ত কাজকর্ম তদারক করত—এমনকী রোদে পুড়তে, জলে ভিজতে ও শীতে কাঁপতেও তার কিছুমাত্র আপত্তি হত না।

কিন্তু যে-শ্রেণীর লোকই হোক, লক্ষ্মীলাভ করলে মানুষের মন অল্প-বিস্তর না বদলে পারে না। ছিদামের তিন ছেলে। সে নিজে হাঁটুর উপরে মোটা কাপড় পরে বটে, কিন্তু কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ছেলেদের জন্যে 'চাঁদনি-চক' থেকে নানানরকম রংচঙে জামাকাপড় কিনে আনায়। ছিদামের নিজের কখনও হাতে-খড়িও হয়নি, কিন্তু ছেলেদের সে ভর্তি করে দিয়েছে গাঁয়ের স্কুলে। নিজে লেখাপড়া জানে না বলে লক্ষ্মীলাভ করে নানাদিকে আজ তার অসুবিধা হচ্ছে নানানরকম। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে দু-লাইন চিঠি লেখবার জন্যেও তাকে পরের দ্বারস্থ হতে হয়। তার মূর্খতার সুযোগ নিয়ে ধূর্ত লোকেরা মাঝে মাঝে তাকে বেশ দু-পয়সা ঠকিয়েও যায়। এইসব বিপদ থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছেলেদের সে স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ছিদামের বাড়ি বড়ো না হলেও সেখানা হচ্ছে কোঠাবাড়ি এবং ছিদামদের গাঁয়ে কোঠাবাড়ি আছে কেবল গায়ের জমিদারদের। এই হিসেবে মদনপুর গায়ের মধ্যে লোকে জমিদারদের পরেই নাম করত ছিদাম চাষার।

ছিদাম সেদিন সকালে বাড়ির সদর দরজার কাছে একখানা টুলের উপরে বসে কোয় টান মারছে, এমন সময় তার বড়োছেলে হারু সেখানে এসে হাজির হল।

এখানে হারুর একটুখানি পরিচয়ের দরকার, কারণ আমাদের কাহিনির নায়ক হচ্ছে এই হারু বা হারাধনই।

হারাধনের বয়স হবে পনেরো কী ষোলো। কিন্তু এই বয়সেই দেখতে সে হয়ে উঠেছে মস্ত জোয়ান এক পুরুষ মানুষের মতন। এখনই সে মাথায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা এবং তিন-চার বছরের ভিতরেই মাথায় যে ছয় ফুটকেও ছাড়িয়ে যাবে, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। তার বুকের ছাতি রীতিমতো চওড়া, আর তার সর্বাঙ্গ দিয়ে সর্বদাই চামড়ার তলা থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট মাংসপেশি। প্রতিদিন নিয়মিত ডন-বৈঠক দিয়ে ও কুস্তি লড়ে দেহখানিকে সে রীতিমতো তৈরি করে তুলেছে। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও সুন্দর মুখশ্রী দেখলে কেউ তাকে চাষার ছেলে বলে ধরতে পারবে না।

হারাধন এই বছরেই গাঁয়ের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সফল হয়েছে। যে-কোনও চাষার ছেলের পক্ষে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সফল হওয়া অল্প গৌরবের কথা নয়, এবং এ-বিষয়ে সে নিজে এবং তার বাপ ছিদাম দুজনেই দস্তুরমতো সচেতন।

হারাধন চাষার ছেলের মতনও লালিত-পালিত হয়নি। কেমন করে লাঙল ধরতে হয়, তাও বোধহয় সে জানে না। স্কুলের সমস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে সে সমানভাবেই মেলামেশা করে এবং তার বাপের কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রসাদে গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলেদের তরফ থেকেও কোনওরকম আপত্তি ওঠে না।

আর আপত্তি উঠবেই বা কেমন করে? মদনপুর হচ্ছে একখানি ছোটোখাটো গ্রাম। এখানকার অধিকাংশ তথাকথিত ভদ্রলোকই হচ্ছে গরিব গৃহস্থ। তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই আছে এবং যখন-তখন অনেক ভদ্রলোককেই টাকা ধার করবার জন্যে ছিদামের দ্বারস্থ হতে হয়। ভদ্রলোকদের এই অক্ষমতা দেখে এবং নিজের ক্ষমতার পরিমাণ বুঝে ছিদাম মনে মনে অনুভব করে বিশেষ একটা গর্ব।

কিন্তু মাঝে মাঝে বেসুরো সুর বেরিয়ে পড়ে। হয়তো কোনওদিন হারাধন শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না, অমনি তার মুখ থেকে টিটকারি শোনা গেল, ব্যাটা চাষার ছেলে, কত আর বুদ্ধি হবে।

গাঁয়ের জমিদাররা যে বিশেষ সম্পত্তিশালী, তা নয়; হয়তো দরকার পড়লে হারাধনের বাপ এককথায় তাদের চেয়ে বেশি টাকা ঘর থেকে বার করে দিতে পারে। কলকাতা শহর হলে তাদের মতন জমিদারদের দিকে সাধারণ গৃহস্থরাও ফিরে চাইত না। কিন্তু তাহলে কী হয়, তবু তারা জমিদার। এই বনগাঁয়ের শিয়াল-রাজা!

অতএব জমিদার-বাড়ির যে ছেলেটি হারাধনের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে, সে স্পষ্টাস্পষ্টিই চাষার ছেলে বলে তাকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করত। হারাধন একদিন তাকে 'ভাই' বলে ডেকে কথা কইতে গিয়েছিল, কিন্তু জমিদার-নন্দন উত্তরে তার সঙ্গে একটা কথাও কয়নি বা তার দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। এমনকী ক্লাসের ভিতরে চাষার ছেলে হারাধনের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতেও সে নারাজ ছিল। জমিদারের ছেলে প্রায়ই কলকাতায় যায় এবং শহরের সমস্ত হালচাল তার নখদর্পণে। যখন-তখন কলকাতা থেকে সে হাল-ফ্যাশানের কাপড়-চোপড় পরবার কায়দা শিখে আসে এবং হারাধনের ‘চাঁদনিচক’ থেকে সস্তায় কেনা রেডিমেড ও রংচঙে পোশাকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ টিপে-টিপে হাসে এবং অন্য কোনও ছেলেকে ডেকে চাপা-গলায় অথচ হারাধন যাতে শুনতে পায় এমন স্বরে

বলে, চাষার ছেলে, ভদ্রলোক হয়েছেন! আহা, কী পোশাক! হতভাগা, পাড়াগেঁয়ে ভূত!

এইসব অপমান হারাধনকে মুখ বুজে সহ্য করতে হত। যদিও সে জানে ইচ্ছা করলে এক ঘুষি মেরেই জমিদারপুত্রকে এখনি ভূমিসাৎ করতে পারে, তবু মনের রাগ তাকে মনেই পুষতে হত নীরবে। কারণ তার বাপ বলে দিয়েছিল, জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করলে তাদের নিজেদেরই বিপদের সম্ভাবনা বেশি।

একদিন এমনিতরো কী-একটা ব্যাপারের পর হারাধন মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে, সে আর এ-গ্রামে থাকবে না। সে কলকাতায় চলে যাবে—যেখানে কেউ তাকে চাষার ছেলে বলে চেনে না। কলকাতা থেকে যদি সে কখনও ফিরে আসে, তবে ভদ্রলোক নাম কিনেই ফিরে আসবে। কয়েকদিন ধরে মনে মনে এই কথা ভেবে তার প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতন অটল ও সুদৃঢ়। এবং হারাধনকে যারা চেনে তারাই জানে যে সে হচ্ছে অত্যন্ত একরোখা ছেলে, যা ধরবে তা করবেই।

এইবার সেদিন সকালের কথা বলি।

টুলের উপরে উবু হয়ে বসে তামাক টানতে টানতে ছিদাম যখন অর্ধ-নিমীলিত চোখে দেখলে হারাধন তার সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, তখন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে বললে, কীরে হারু, কিছু বলতে চাস নাকি? নতুন জামা-কাপড় চাই, না আর কিছু? সে জানত বিশেষ দরকার না হলে শ্রীমান হারু কোনওদিনই তার সামনে এসে হাজির হয় না।

হারাধন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, একটু দরকার আছে বাপি!

—দরকারটা কী শুনি?

অল্প ইতস্তত করে হারাধন মনের বাসনা একেবারেই প্রকাশ করে ফেললে। বললে, বাপি, আমি কলকাতায় যেতে চাই!

ছিদাম দুই ভুরু তুলে সবিস্ময়ে বললে, বলিস কী রে! কলকাতায় যাবি? কার সঙ্গে রে?

—কারুর সঙ্গে নয়।

এবারে আর ছিদামের বিস্ময়ে সীমা রইল না। সে বললে, কারুর সঙ্গে নয়? তুই একলা কলকাতা যাবি?

—হ্যাঁ বাপি।

ছিদাম গম্ভীর মুখে হুকোয় দু-চারটে টান মেরে বললে, তোর মাথায় এ কুবুদ্ধি কে দিলে শুনি?

—কেউ দেয়নি। আমি নিজেই অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলুম যে কলকাতায় না গেলে কোনওদিনই আমি ভদ্রলোক হতে পারব না।

ছিদাম এইবারে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে তামাক-টানা ছেড়ে হুঁকোটা নীচে নামিয়ে রাখলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, কলকাতায় না গেলে তুই ভদ্রলোক হতে পারবি না, বটে? তোর কথার মানে কী রে ব্যাটা? তুই যে চাষার ছেলে, কলকাতায় গিয়ে সেটা ভুলতে চাস নাকি?

হারাধন পণ্ডিত না হলেও একালের লেখাপড়া কিছু কিছু শিখেছে। সে বললে, কে যে চাষার ছেলে, আর কে যে মুটের ছেলে, একথা কারুর গায়ে চিরদিন লেখা থাকে না! শুনেছি আমাদের গাঁয়ের জমিদারের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন খুনে, ঠগি, ডাকাত। কিন্তু আজও কি তাদের কেউ ওইসব নামে ডাকে? ডাকাতের বংশধররা যদি হতে পারে বড়ো বড়ো বাবু, ভদ্রলোক, তাহলে চাষার ছেলেরাই বা কী দোষটা করলে? ডাকাত হওয়ার চেয়ে কি চাষা হওয়া ভালো নয়? স্বর্গে যেতে পারে কারা, ডাকাতরা না চাষারা? তুমি তো জমিদারদের চেয়েও বড়োলোক, তবে তোমার ছেলে আমিই বা ভদ্রলোক হতে পারব না কেন?

ছিদাম জানে চাষ-বাস করতে, কুলি মজুর খাটাতে, শস্য বেচে টাকা জমাতে আর সেই টাকা সুদে খাটাতে ক-য়ের পাশে খ-কে দেখলে সে চিনতে পারে না, কেতাবি বুলিও কোনওদিন শিখতে পারেনি। হারাধন স্কুলে পড়লেও যে এমন সব আশ্চর্য কথা বলতে শিখেছে, এটা সে কোনওদিন ধারণাতেও আনতে পারেনি। তার মতন এক চাষার ছেলে হারাধনের মুখে এই সব বড়ো বড়ো কথা শুনে সে কেবল ভড়কেই গেল না, মনে মনে খুশিও হল খানিকটা। ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছিদাম বললে, কলকাতা কত বড়ো শহর জানিস?

হারাধন বললে, কী করে জানব বাপি? তুমি তো কোনওদিন আমায় কলকাতায় নিয়ে যাওনি?

ছিদাম বললে, হেঃ, তোর বাপই কলকাতায় গেছে কবার রে ব্যাটা। মোটে তিনবার! একবার খুব ছেলেবেলায়, একবার দশ বছর আগে, আর একবার

বছর-পাঁচেক আগে। যতবারই গিয়েছি, ততবারই দেখেছি, ওই রাক্ষুসে শহরটা দিনে দিনে যেন আরও ডাগর হয়ে উঠছে। সেখানে বাইরে বেরুলে লাখো লাখো মানুষের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, সেখানে পথে পা বাড়ালেই মস্ত মস্ত হাওয়া-গাড়িরা বাঘ-ভালুকের মতো মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে, সেখানে হওয়া-গাড়িদের ফাঁকি দিলেও চোর-জোচ্চোর-গুণ্ডাদের ফাঁকি দেবার জো নেই, সেখানে লাল-পাগড়ি-পরা চৌকিদাররা চোরদের কিছু বলে না, কিন্তু সাধুদের ধরে নিয়ে যায় হাতে দড়ির বাঁধন দিয়ে! এমন শহরে যে তুই যেতে চাস, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবি কেমন করে?

হারাধন বললে, বুদ্ধির জোরে।

ছিদাম হা হা করে হেসে উঠে বললে, দু-পাতা পড়তে শিখলেই কারুর বুদ্ধির জোর বাড়ে না রে গাধা! আর খালি বুদ্ধির জোরই সব নয়, বুঝেছিস?

হারাধন বুক ফুলিয়ে বললে, আমার গায়ের জোরও আছে।

ছিদাম নীরবে আর একবার ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আয়, দেখি তোর গায়ের জোরের একটু নমুনা। বলেই নিজের রৌদ্রদগ্ধ, পেশিবহুল সবল ও স্থুল ডান হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে, হাতের পাঁচ আঙুল ফাঁক করে।

হারাধন বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, আমায় কী করতে বলো বাপি?

ছিদাম বললে, আমার এই হাতখানা দেখছিস? ভারী লাঙল ঠেলে ঠেলে আমার এই হাত হয়েছে লোহার মতন শক্ত! এই হাতের এক ঘুষি মেরে আমি ডাব ভেঙে তার জল খেতে পারি! আর এই হাতের এক এক টানে বড়ো বড়ো বলদ শান্ত-শিষ্ট ভেড়ার মতন সুড়সুড় করে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। পারবি আমার এই হাতখানা ভাঙতে? পারবি আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে?

হারাধন প্রথমটা ইতস্তত করতে লাগল। ভাবতে লাগল, ছেলে হয়ে বাপের সঙ্গে পাঞ্জালড়া উচিত কি না? সে আজ পর্যন্ত যত বই পড়েছে তার কোনওখানার ভিতরেই দেখেনি, বাপের সঙ্গে ছেলের পাঞ্জা-লড়ার কোনও কথাই। বাধো বাধো গলায় বললে, তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব কী বাপি?

ছিদাম বললে, কী রে হেরো, তোর ভয় করছে নাকি? পাঞ্জা লড়তে যে ভয় পায়, সে যেতে চায় কলকাতায়? আরে ধ্যাত!

হারাধনের সমস্ত ইতস্ততভাব কেটে গেল। সে তখনই দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে বাপের হাতের সঙ্গে নিজের হাত মেলালে।

ছিদাম অবহেলা-ভরে বললে, ভাঙ দেখি আমার হাতখানা! সে নিজের হাতে বিশেষ কোনও জোর না দিয়েই কথাগুলো বলছিল, কিন্তু তার মুখের কথা ফুরুতে না ফুরুতেই হারাধন তার হাতখানা ভেঙে দিয়েছিল আর কী! ছিদাম তাড়াতাড়ি নিজের হাতখানা শক্ত করে নিজেকে সামলে নিলে এবং বুঝলে যে তার ছেলের সঙ্গে ছেলেখেলা করলে চলবে না!

তারপর মিনিট-দুয়েক ধরে চলল তাদের পাঞ্জার লড়াই। তখন ছিদামের কাছে এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তার ছেলেকে আর ছেলেমানুষ বলে অস্বীকার করা চলে না। আজ এখনও হারাধন তার পাঞ্জা ভাঙতে পারেনি বটে, কিন্তু সেও প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করেও ছেলের পাঞ্জাকে একটুও হেলাতে পারলে না। আর বছর-দুয়েক পরে হারাধনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়লে তার পরাজয় যে সুনিশ্চিত এ-বিষয়েও কোনওই সন্দেহ নাই। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছিদাম হাঁপাতে হাঁপাতে দেখলে তার ছেলের শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও স্বাভাবিকই আছে।

সে খুশি হয়ে ছেলের পিঠ চাপড়ে বললে, শাবাশ মরদের বাচ্চা, শাবাশ! তোকে আর আমার কিছুই বলবার নেই, তুই যেখানে ইচ্ছে যেতে পারিস।

হারাধন তাড়াতাড়ি বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, বাপি, তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছি বলে আমাকে মাপ করো!

মাপ করব কী রে ব্যাটা? তোর মতন ছেলেই যে আমি চাই—বাপকে বেটা, সিপাইকা ঘোড়া!

হারাধন বললে, তাহলে আমি কলকাতায় যাব বাপি?

—আলবত যাবি!

—কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আমি কোথায় থাকব বলতে পারো?

ছিদাম হেসে উঠে বললে, কানা কখনও কানাকে পথ দেখাতে পারে রে? কলকাতায় গিয়ে তুই কোথায় থাকবি, তা আমি কেমন করে বলব কলকাতায় আমি গিয়েছি বটে, কিন্তু তাকে শুধু চোখে দেখেছি; বুঝেছিস? ও-শহরটাকে দেখলে আমার ভয় হয়, নিতান্ত দায়ে না পড়লে ওখানে আর আমি যাব না! তোর যদি বুকের পাটা থাকে, কলকাতায় নিজের বাসা নিজেই বেঁধে নিস। পারবি?

—খুব পারব।

—বেশ, তাহলে যাবার সময় আমার কাছ থেকে শদুয়েক টাকা নিয়ে যাস। পরে আরও টাকার দরকার হলে আমাকে চিঠি লিখিস।

হারাধন মহা আনন্দে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমার মতন বাপি আর কারুর নেই।

মেয়েটির নাম খুকি নয়

মার্টিনের রেলগাড়িতে চড়ে হারাধন চলেছে কলকাতায়। গাড়ির দুই ধারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে খালি দেখা যায় আকাশ, মাঠ, বন, নদী, ধানখেত, পানীয়-ভরা পুকুর আর ছোটো-বড়ো গ্রাম। এসব দেখতে তার একটুও ভালো লাগল না। সে মানুষ হয়েছে পল্লি-প্রকৃতির কোলে, এইসব দেখতে দেখতেই আজ তার বয়স হল প্রায় ষোলো।

আকাশ আর মাঠ আর গ্রাম, যেদিকেই তাকায় সে কলকাতার বিচিত্র সব স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। সারাপথ এমনি স্বপ্ন দেখতে দেখতে শেষটা সন্ধ্যার কিছু আগে সে মার্টিনের ডেরা কদমতলা ইস্টিশানে গিয়ে পৌঁছোল।

যেখানে গিয়ে নামল হারাধন সেইখানটা দেখেই অবাক হয়ে গেল। একখানা গণ্ডগ্রামের বাসিন্দা সে, এক জায়গায় এত বাড়ির পর বাড়ি, এত গাড়ির পর গাড়ি আর এত লোকজনের ছুটোছুটি তার চোখে আর কখনও পড়েনি। কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মতন এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করতে করতে ভাবতে লাগল, এই কদমতলার চেয়েও কি কলকাতা আরও বড়ো, আরও জমকালো?

সামনে এক ভদ্রলোককে দেখে হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, মশাই, আমি কোন পথ দিয়ে কলকাতা যেতে পারব, বলতে পারেন?

ভদ্রলোক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার পোশাক ও মুখের ভাব লক্ষ করে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কলকাতায় কখনও আসনি বুঝি?

হারাধন মনে মনে বুঝলে তার চেহারায় এখনও পাড়াগেঁয়ে ভাব মাখা আছে বলেই বাবুটি তাকে এমন প্রশ্ন করলেন। একটু লজ্জিত হয়ে বললে, আজ্ঞে না।

—তবে একলা কলকাতায় এসেছ কেন? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি?

—আজ্ঞে না। বাবাকে বলে এসেছি।

—তোমার বাবা তোমাকে আসতে দিলেন? দেখছি তোমার বাপের বুদ্ধিও তোমার চেয়ে বেশি নয়। কলকাতায় এসে কী করবে? চাকরি?

হারাধন গর্বিত স্বরে বললে, আজ্ঞে না, চাকরি করতে আসিনি। আমি কলকাতায় বেড়াতে এসেছি।

ভদ্রলোক দুই ভুরু কপালে তুলে বললেন, ও, তাই নাকি? বেশ, তবে ওই পথ ধরে চলে যাও! বলে তিনি হাত তুলে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

হারাধন পায়ে পায়ে এগুতে লাগল। সে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে, এবং তার কৌতুহলী মুখ দেখলেই কারুর বুঝতে দেরি লাগবে না যে, সে হচ্ছে কোনও অজ পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা।

আধঘণ্টা চলবার পর পথের ধারে একখানা খাবারের দোকান দেখে হারাধন-এর মনে পড়ল, আজ বৈকালে তার খাবার খাওয়া হয়নি। একটি টিনের বাক্সে ভরে তার মা দিয়েছিলেন খানকয় পরোটা, কিছু তরকারি ও গোটা-চারেক নারিকেল নাড়। খাবার তো সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু জল তো নেই।

এধারে ওধারে চোখ রেখে আরও খানিক এগিয়ে পথের ধারে সে দেখলে একটি গাছপালায় ও ঝোপে ঝোপে ভরা জায়গা এবং তার পাশেই রয়েছে একটি পুষ্করিণী।

পুকুরের ধারে গিয়ে সে একটি বড়ো গাছের গুড়িতে পিঠ রেখে বসে পড়ল। তারপর খুললে খাবারের বাক্সের ডালা।

চারিদিক তখন সন্ধ্যার আবছা আলোয় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মায়ের হাতের তৈরি খাবার খেতে খেতে বাড়ির কথা মনে করে হারাধনের মনটা একটু হা-হা করে উঠল। এর আগে সে কখনও নিজের গায়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে

আসেনি, তাই তার কলকাতা আসবার কথা শুনেই তার মা যে কেঁদে-কেটে কতখানি কাতরতা প্রকাশ করেছিলেন, এটাও তার মনে পড়ল।

কেবল মা আর তার ছোটো ভাইগুলির কথা নয়, মনে হতে লাগল তার সমবয়সী খেলুড়েদেরও কথা—যাদের সঙ্গে ছুটির সময় সে হাটে-মাঠে-বাটে ছুটাছুটি করে বেড়াত, নদীর জলে সাঁতার কাটত, নৌকা বাইত, পরের আম-জাম-কাঁঠাল বলে লুকিয়ে ঢুকে নিষিদ্ধ ফল চুরি করত এবং গাঁয়ের পথে পথে হা-ডু-ডু ও ডাণ্ডা-গুলি খেলত। আরও কারুর কারুর কথা স্মরণ করে তার মন হু-হু করতে লাগল; সেই ভুলো কুকুরটা, তার সঙ্গে খেতে না বসলে সে কেউ কেউ করে কেঁদে সারা হত, আর সেই পোষা মেনি বিড়ালটা, যার তিনটে ধবধবে সাদা বাচ্চার সবে ফুটেছে চোখ, আর তাদের সেই উঠোনের বকুলগাছের ডালে ঝোলানো খাঁচর সেই টিয়াপাখিটা, যে তাকে দেখলেই 'হেরো, হেরো' বলে ডেকে উঠত!

এইসব ভাবতে ভাবতে তার মায়ের দেওয়া খাবার যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে হঠাৎ সে পিছনে কাদের সাড়া পেলে। ফিরে দেখে দুজন লোকের সঙ্গে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে রংচঙে ভালো পোশাক পরা একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, বয়স তার দশ-এগারোর বেশি নয়।

মেয়েটি বলছে, এই তো একটা পুকুর রয়েছে! এইখানেই কি লাল মাছ পাওয়া যায়? একটা লোক বললে, না খুকি, ওই যে জঙ্গলটা দেখছ, ঠিক ওর ওপাশেই যে পুকুরটা আছে, সেইখানেই পাওয়া যায় রুইমাছের মতন বড়ো বড়ো লাল মাছ।

মেয়েটি ভয় পেয়ে বললে, মাগো রুইমাছের মতন বড়ো বড়ো লাল মাছ নিয়ে খেলব কেমন করে? আমি চাই বাটামাছের মতন ছোটো ছোটো লাল মাছ, যাদের চৌবাচ্চায় রাখা যায়!

লোকটা বললে, বেশ খুকি, তাই হবে। সেইরকম লাল মাছই আমরা তোমাকে ধরে দেব।

হারাধন ভাবতে লাগল, মেয়েটিকে দেখলেই তো খুব বড়োঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়, কিন্তু ওই লোক-দুজনের চেহারা তো সুবিধের বলে বোধ হচ্ছে না! ওদের মুখ দেখলেই মনে হয়, ওরা যেন পাকা বদমাইশ। ও-রকম লোকের সঙ্গে অমন সুশ্রী মেয়ে কেন?

হঠাৎ ঝোপের ওপাশ থেকে উচ্চস্বরে কান্না জাগল, ওগো মাগো—

কান্নাটা হঠাৎ জেগেই হঠাৎ থেমে গেল—যেন যে কাঁদছে, জোর করে কেউ তার মুখ চেপে ধরেছে!

হারাধন একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর মাটির উপর থেকে তার মোটা লাঠিগাছা চট করে তুলে নিয়ে দৌড়ে সেই ঝোপের ভিতর গিয়ে ঢুকল। তারপর সেখানকার দৃশ্য দেখেই তার চোখ আর মন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মেয়েটিকে মাটির উপরে লম্বা করে ফেলে একটা লোক হাঁটু দিয়ে তার দুই পা ও দুই হাত দিয়ে তার মুখ প্রাণপণে চেপে আছে, এবং আর একটা লোক তার গলা থেকে একছড়া সোনার হার টেনে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে!

হারাধন স্তম্ভিত হয়ে রইল এক মুহূর্তের বেশি নয়। ব্যাপারটা বুঝতে তার একটু দেরি হল না। তখনই সে বাঘের মতো লোক-দুটোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যে হার ছিনিয়ে নিচ্ছিল তার পিঠের উপরে মারলে প্রচণ্ড এক লাঠি, আর মেয়েটিকে যে চেপে ধরেছিল তাকে মারলে প্রচণ্ড এক লাথি!

এই লাঠি আর লাথি খেয়েই লোক-দুটো প্রথমে সশব্দে মাটির উপরে পড়ে গেল, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই উঠে চোঁ-চোঁ চম্পট দিলে। হারাধন লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের পিছনে পিছনে ছুটল, কিন্তু ঝোপের বাইরে এসে দেখলে, এর মধ্যেই তারা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। তারপর আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়ার ভিতরে তারা কোথায় একেবারে অদৃশ্য হয়ে

গেল। তাদের ধরবার চেষ্টা করে আর কোনওই লাভ নেই বুঝে সে আবার ঝোপের ভিতরে ফিরে এল।

মেয়েটি তখন মাটির উপরে পা ছড়িয়ে বসে চেঁচিয়ে কাদতে শুরু করে দিয়েছে। হারাধনও তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে মিষ্টিগলায় বললে, আর কেঁদো না খুকি, আর কোনও ভয় নেই! হতভাগারা পালিয়ে গিয়েছে।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমি বাড়ি যাব।

হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বাড়ি কোথায় খুকি?

মেয়েটি হাত তুলে একদিক দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই দিকে।

—তুমি বাড়ি যাবার পথ চিনতে পারবে?

—ওরা তোমার কোনও গয়না কেড়ে নিয়ে যায়নি তো?

— না।

হারাধন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো খুকি, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই, চলো। মেয়েটি তবু উঠল না, সভয়ে ও সন্দিগ্ধ চোখে হারাধনের মুখের পানে ফ্যাল-ফাল করে তাকিয়ে রইল।

তার মনের ভাব বুঝে হেসে ফেলে হারাধন বললে, খুকি, তুমি বুঝি ভাবছ, এক পাপের পাল্লা থেকে তুমি আর এক পাপের পাল্লায় এসে পড়েছ? ভয় নেই, আমিও তোমার গয়না কেড়ে নেব না।

মেয়েটি লজ্জিত মুখে বললে, না। তোমাকে আমার ভয় করছে না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, না?

হারাধন হাসতে হাসতে বললে, তুমি যখন বলছ, তখন লক্ষ্মীছেলে হতে আমি বাধ্য! তোমার অমন সুন্দর মুখের মিষ্টি হুকুম মানবে না, দুনিয়ায় এমন পাষণ্ড কে আছে?

মেয়েটিও এতক্ষণ পরে হেসে ফেলে বললে, তুমিও সুন্দর নও নাকি? তাহলে তোমাকে আমার ভালো লাগছে কেন?

—বেশ, তাহলে আমরা দুজনেই সুন্দর! সন্ধে হতে আর দেরি নেই, এখন ওঠে খুকি।

—তবে তোমার নাম কী?

—প্রীতি।

হারাধন মেয়েটিকে নিয়ে এগুতে এগুতে বললে, আচ্ছা প্রীতি, ও লোক-দুটাে কে? ওদের সঙ্গে তুমি এখানে এসেছিলে কেন?

প্রীতি বললে, পথের ধারে একটা গাছের ডালে বসে একটি রঙিন পাখি খাসা গান গাইছিল। তাকে ভালো করে দেখবার জন্যে আমাদের বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু গাছের কাছে যেতেই দুষ্ট পাখিটা গান থামিয়ে উড়ে গেল আর ওই লোক-দুটো কোথা থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। যে-লোকটা আমার হার কেড়ে নিচ্ছিল, সে বললে, লাল পাখিটা উড়ে গেল খুকি? আমি যাক গে' বলে চলে আসছি, সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, লাল পাখি উড়ে গেল তো কী হয়েছে? তুমি বড়ো বড়ো লাল মাছ ভালোবাস তো? আমি বললুম, খুব ভালোবাসি। সে বললে, কাছেই একটা পুকুরে খুব বড়ো বড়ো লাল মাছ আছে। দেখে যদি তোমার পছন্দ হয়, আমি তোমাকে অনেকগুলো মাছ ধরে দিতে পারি। তারপর সে আমার হাত ধরে বললে, তাহলে আমার সঙ্গে চলো, তারপর যত চাও, তত মাছ ধরে দেব। সেই কথা শুনেই আমি কোকার মতন ওদের সঙ্গে এসেছিলুম। আমাকে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে নিয়ে চলো। আমাকে দেখতে না পেয়ে সবাই হয়তো ভেবেই সারা হচ্ছে।

—তোমাকে আমি কেমন করে নিয়ে যাব প্রতি? তোমার বাড়ির পথ তো তুমিই জানো! বড়ো-জোর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারি!

—তাই এসো। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার আর ভয় করবে না।

হারাধনের একখানি হাত নিজের নরম-তুলতুলে ছোট্ট মুঠোর ভিতরে নিয়ে প্রতি একদিকে অগ্রসর হল।

হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন?

'বাবা আছেন। মা আছেন, আমার ছোটো ভাই আছে আর ঝি-চাকর-বামুনরা আছে। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেটা আমাদের বাড়ি নয়।

—তবে?

—আমাদের বাড়ি কলকাতায়। এখানে আমাদের বাগানবাড়ি। মাঝে মাঝে এই বাগানে আমরা বেড়াতে আসি।

—তোমার বাবা কী করেন?

—তিনি ব্যারিস্টার।'

এই রকম সব কথা কইতে কইতে মিনিট-দশেকের পরে প্রতি যখন তাদের বাগানবাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হল তখন সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

প্রীতির বাবার নাম মিস্টার রতন রায় ও তার মায়ের নাম প্রতিমা দেবী। ইতিমধ্যেই প্রীতিকে বাড়ির ভিতরে দেখতে না পেয়ে তারা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে বাগানের ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং মেয়ের খোঁজে চারিদিকে পাঠিয়েছেন বেয়ারা ও দারোয়ানদের। মা আর বাবাকে দেখতে পেয়েই প্রীতি দৌড়ে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং প্রতিমা সানন্দে প্রীতিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি প্রীতি?

প্রীতি কোনও জবাব না দিয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে আবার কেঁদে উঠল। হারাধন ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল, মিস্টার রায় হঠাৎ কঠোর স্বরে তাকে ডেকে বলে উঠলেন, এই ছোকরা দাড়াও!

মিস্টার রায়ের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হয়ে হারাধন ঘুরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিস্টার রায় বললেন, আমার মেয়ে কাঁদছে কেন? তুমি একে ধরে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?

প্রীতি তাড়াতাড়ি মায়ের কোল ছেড়ে বাবার কাছে এসে বললে, ওকে তুমি বোকো না বাবা! ওকে আমার ভালো লেগেছে।

মিস্টার রায় আরও বেশি বিস্মিত ভাবে বললেন, ওকে তোর ভালো লেগেছে তো, কাঁদছিস কেন? তোর কী হয়েছে তুই কোথায় গিয়েছিলি?

প্রীতি তখন একে একে সব কথা খুলে বললে। শুনতে শুনতে মিস্টার রায় ও প্রতিমা দেবীর সর্বাঙ্গ ভয়ে আর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল।

প্রীতির কথা শেষ হলে পর প্রতিমা আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিউরে উঠে বললেন, আর তোকে কখনও বাইরে ছেড়ে দেব না, আজ ভগবান তোকে বাঁচিয়েছেন! মিঃ রায় এগিয়ে গিয়ে হারাধনের একখানি হাত ধরে অনুতপ্ত স্বরে বললেন, ভগবান আমার প্রীতিকে বাঁচিয়েছেন বটে, কিন্তু তুমি হচ্ছ ভগবানেরই দূত! তোমাকে সন্দেহ করেছি বলে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

হারাধন লজ্জিত মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও জবাব দিতে পারলে না। প্রতিমা সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী বাবা?

—আজ্ঞে, হারাধন পাল।

মিস্টার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, হারাধন, তোমাকে দেখে তো এখানকার লোক বলে মনে হচ্ছে না? তুমি কোথায় থাকো?

—আজ্ঞে, আমার দেশ মদনপুরে। আমি কলকাতা দেখতে এসেছি।

—তুমি এর আগে কলকাতায় কখনও এসেছিলে?

—আজ্ঞে না?

—তুমি কার সঙ্গে এসেছ?

—আজ্ঞে, একলা এসেছি।

মিস্টার রায় বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তুমি এর আগে কলকাতায় কখনও আসনি, অথচ একলাই কলকাতা দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছ?

—আজ্ঞে হ্যা।

—এখানেও আমি ভগবানের হাত দেখতে পাচ্ছি! ভাগ্যে তোমার মাথায় এই দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, তাই আজ আমার মেয়ে প্রাণে বেঁচে বাড়িতে ফিরে এসেছে। হারাধন, তুমিই প্রীতির জীবন-রক্ষা করেছ! তোমাকে কী বলে আদর করব বুঝতে পারছি না।

হারাধন আবার লজ্জিত হয়ে একটা নমস্কার করে পায়ে পায়ে এগুতে এগুতে বললে, আজ্ঞে, আমি তবে আসি।

মিস্টার রায় তাড়াতাড়ি তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হয় না বাপু, আজ তোমাকে আমার এখানে থেকে যেতেই হবে। কাল আমি তোমাকে নিয়ে নিজেই কলকাতায় যাব।

হারাধন মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে না! আমার সঙ্গে কারুকে যেতে হবে না! আমি একলাই কলকাতা যেতে পারব!

তার কথা কইবার ধরন-ধারণ দেখে মিস্টার রায় হোঁ হোঁ করে হেসে উঠলেন। প্রতিমাও হাসতে হাসতে বললেন, বেশ বাবা, তাই যেয়ো। কিন্তু আজ নয়, কাল সকালে। আজ আমি তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করছি, আমার কথা রাখবে না বাবা?

হারাধন কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল বোবার মতন। মিস্টার রায় বললেন, প্রীতি, আমাদের এই হারাধনবাবুটি হচ্ছেন তোর বড়োদাদা। ওকে ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আয় তো।

প্রীতি ভারী খুশি হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে হারাধনের কাছে ছুটে এল, তারপর তার দুই হাত ধরে টানতে টানতে বাগানের ফটকের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দুই পাশে দেশি-বিলাতি ফুলগাছের সারি, তারই মাঝখান দিয়ে কাঁকর-বিছানো পথখানি বাংলোর ধাঁচায় তৈরি একতলা বাড়ির দিকে চলে গিয়েছে।

পথের শেষে পাঁচ-ছয়টি সিঁড়ির ধাপ পার হয়েই বাংলোর বারান্দা। সেইখানে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট একটি টুকটুকে খোকা, বয়স তার ছয়-সাত বছরের বেশি নয়। তার টানা টানা জোড়া ভুরু, ডাগর-ডাগর চোখ, টিকলো নাক, রাঙা ফুলের পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট আর কোঁকড়ানো চিকন-কালো চুলের গোছা দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে সে হচ্ছে প্রীতির ছোটোভাই। দুজনের চেহারায় আশ্চর্য মিল!

হঠাৎ অপরিচিত হারাধনের আবির্ভাবে খোকাবাবু যথেষ্ট দমে গিয়ে পায়ে পায়ে পিছোবার চেষ্টা করলেন।

প্রীতি তাকে অভয় দিয়ে বলে উঠল, ও বিমান, ভয় কী রে বোকা? এ যে আমাদের নতুন দাদা!

বিমান দাঁড়িয়ে পড়ে তার ডাগর চোখ-দুটিকে আরও বিস্ফারিত করে তুলে হারাধনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপরেই সকৌতুকে নেচে উঠে হাততালি দিয়ে বললে, আমাদের নতুন দাদা? ও হে, কী মজা!

মিস্টার রায়, প্রতিমা দেবী, প্রতি ও বিমান সবাই মিলে তাদের নতুন অতিথিকে এমন স্নেহ-মায়ার মধুর বাঁধনে বেঁধে ফেললেন যে, হারাধন তিনদিনের আগে সে পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলে না।

তিনদিনের পরেও মিস্টার রায় ও প্রতিমা তাকে ছাড়তে রাজি হচ্ছিলেন না, কিন্তু হারাধনের বিশেষ জেদ দেখে তারা আর আপত্তি করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে হারাধনের মুখে মিস্টার রায় তার সমস্ত কাহিনি ও আশা-আকাঙক্ষার কথা শ্রবণ করেছেন। হারাধন যখন নিজের ব্যাগ ও মোটা লাঠিগাছটি নিয়ে বাংলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে পথের উপর গিয়ে দাঁড়াল, মিস্টার রায় তার দুই কাঁধের উপরে তার দুই হাত রেখে বললেন, হারাধন, তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি না, আমি বলতে চাই—আবার এসো! তোমাকে আমার এত ভালো লেগেছে যে, ছেড়ে দিতে মন কেমন করছে। তুমি নিজের উপরে নির্ভর করে একলাই

যখন কলকাতায় যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন আমি আর বাঁধা দিতে চাই না। বাঙালির ছেলেরা সহজে স্বাবলম্বি হতে শেখে না, এটা হচ্ছে আমাদের জাতের একটা মস্ত কলঙ্ক। আমি ইউরোপে গিয়ে দেখেছি, সেখানকার মানুষেরা শিশু-বয়স থেকে স্বাবলম্বন-মন্ত্রের সাধনা করে; সেইজন্যে যে-বয়সে বাঙালির ছেলেরা পৃথিবীর কিছুই বোঝে না, ইউরোপের প্রায়-বালকরাও সেই বয়সেই অনায়াসেই নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তোমার এই অসাধারণত দেখে আমি যে কত খুশি হয়েছি, প্রকাশ করতে পারছি না। বেশ, তুমি একলাই কলকাতায় যাও। কিন্তু শুনে রাখে, আমাদের কলকাতাকে আমিই বিশ্বাস করি না। তোমার বাবা পাড়াগেঁয়ে হলেও ঠিক কথাই বলেছেন। এই রাক্ষুসে শহরকে ভয় করাই উচিত। অতএব আমার কাছে তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

হারাধন বললে, আজ্ঞা করুন।

নিজের জামার পকেট থেকে একখানি কার্ড বার করে মিস্টার রায় বললেন, এই কার্ড'খানি তুমি নিজের কাছে রাখো। এতে আমার নাম, আমার কলকাতার বাড়ির ফোননম্বর আর ঠিকানা লেখা আছে। তুমি যদি কোনও বিপদে পড়ে, তোমার যদি কখনও সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে আমাকে খবর দিতে বা আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলবে না। কেমন, আমার এই অনুরোধটি রাখবে তো?

হারাধন কার্ড খনি নিয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ', তারপরেই মিস্টার রায়কে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি ফিরে যখন হন হন করে এগিয়ে চলল, তখন মিস্টার রায় দেখতে পেলেন না যে তার দুটি চোখ ভরে উঠেছে অশ্রুজলে!

হারাধন ভালো চাকরি করতে নারাজ নয়

কলকাতা।

হ্যারিসন রোডের ফুটপাথ ধরে হারাধন যখন চিৎপুর রোডের চৌমাথায় এসে দাঁড়াল, তখন তার অবস্থা হয়ে উঠেছে রীতিমতো কাহিল। তার দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত, তার বুক করছে ধুকপুক, তার মন উঠছে ক্রমাগত চমকে চমকে এতখানি পথ সে পায়ে হেঁটে এসেছে, না জনতার শত শত লোক ধাক্কা মেরে এই পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়েছে, হারাধন নিজেই এটা বুঝতে পারলে না। এর মধ্যেই সে বার-কয়েক গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে এবং নিজের বোকামির জন্যে গাড়ির চালক ও পথের পথিকদের কাছ থেকে রংবার ধমক খেয়ে খেয়ে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এবং কলকাতায় এসে সে প্রথম জ্ঞান অর্জন করলে যে, এই শহরে পথে বেরুলে ফুটপাত ছেড়ে নীচে নামতে নেই! এখানকার যা-কিছু চোখে পড়ছে সমস্তই তার ধারণাতীত। নানা-দেশি স্ত্রী-পুরুষের বিচিত্র জনতা, রাস্তার দু-ধারকার আকাশ-ছোয়া অট্টালিকাগুলো, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, জলের কল, হরেক-রকম দোকানের সারি, হাওড়ার পোল, গাড়ি আর জনতার কান-ফটানো কোলাহল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া এরোপ্লেনের পর এরোপ্লেন এসব যে সম্ভবপর, স্বপ্নেও সে কোনওদিন ভাবতে পারেনি।

পথ চলতে চলতে বারবার সে দাঁড়িয়ে পড়ছে এবং মূর্তির মতন স্থির হয়ে দেখছে এক একটি অভাবিত দৃশ্য। এইভাবে থেমে থেমে পথ চলার দরুন অবশেষে সে যখন কোনওরকমে কলেজ স্ট্রিটের কাছ বরাবর এসে পৌঁছোল, কলকাতার আকাশ থেকে সূর্য তখন বিদায় নেবার উপক্রম করছে।

ডানদিকে ফিরে খানিকটা এগিয়েই হারাধন কলেজ স্কোয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ পরে এই মানব-অরণ্য এবং ইট-পাথরের মরুভূমির মধ্যে

গাছপালার সুপরিচিত শ্যামলতা ও দিঘির জল দেখে সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল এবং তাড়াতাড়ি বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বাগানের ভিতরে আবার পথের চেয়েও বেশি ভিড়—শিশু, যুবক ও বৃদ্ধরা তখন সেখানে বায়ুসেবন করতে এসেছে। ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সন্তপর্ণে সেই ভিড় ঠেলে সে গোলদিঘির একটি ঘাটের সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। ঘাটের সিঁড়িগুলোর উপরে বেশি লোকজন নেই দেখে হারাধন আস্তে আস্তে জলের কাছে নেমে গেল এবং দুই অঞ্জলি ভরে অনেকটা জলপান করে ফেললে। এতক্ষণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথাও একেবারে ভুলে গিয়েছিল, সারাদিনের পর এই তার প্রথম জলপান।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হারাধন পৈঠার উপরে ধুপ করে বসে পড়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বাগানের দৃশ্য দেখতে লাগল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাগানের দৃশ্যও ঝাপসা হয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

হারাধন তখন ভাবতে লাগল, এইবারে সে কী করবে? পেটের ভিতরে ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠেছে বটে, কিন্তু তার জন্যে বিশেষ ভাবনা নেই; কারণ সে দেখেছে কলকাতার পথের দু-ধারেই আছে খাবারের দোকানের পর দোকান, পয়সা ফেললেই খাবার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যার পরে যখন রাত আসবে, তখন সে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? কলকাতায় হাজার হাজার বাড়ি থাকতে পারে, এবং তার ভিতরে থাকতে পারে লক্ষ লক্ষ মানুষ, কিন্তু সেসব বাড়ির কোনওখানারই ভিতরে তার জন্যে একটুখানি ঠাঁই নেই, কারণ সে কারুকেই চেনে না। আজকের রাতটা না হয় এই বাগানের বেঞ্চিতে শুয়েই কাটতে পারে, কিন্তু আজকের পরে আছে কাল, কালকের পরে আছে পরশু এবং তারপরেও আছে দিনের পর দিন। নিজের গর্বের খাতিরে মিস্টার রায়ের কাছ থেকে এ-সম্বন্ধে কোনও উপদেশ নেয়নি বলে তার মনে অত্যন্ত অনুতাপ হতে লাগল।

ক্রমে অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। হারাধন নিজের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল বলে দেখতে পায়নি যে, এতক্ষণ ধরে তার পিছনে একটু তফাতে বসে একটি লোক চুপ করে তার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছিল। লোকটিকে দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। অন্ধকার গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি আরও নীচে নেমে এসে ঠিক হারাধনের পাশেই বসে পড়ল। তারপর তার কাঁধে একখানা হাত রেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, কী হে জনার্দন, কেমন আছ?

হারাধন বিস্মিত হয়ে লোকটির মুখ দেখবার চেষ্টা করে বললে, আমার নাম তো জনার্দন নয়!

লোকটি তাড়াতাড়ি তার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে অপ্রস্তুত স্বরে বললে, মাপ করবেন মশায়, অন্ধকারে আমি বুঝতে পারিনি! ভেবেছিলুম আপনি বুঝি আমাদের জনার্দন।

—'আজ্ঞে না, আমার নাম শ্রীহারাধন পাল!

—আপনার নাম হারাধনবাবু? আপনার মতো আমারও উপাধি পাল! আমার নাম শ্রীতারাপদ পাল। বেশ, বেশ, এককথায় আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।

এই নতুন লোকটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে হারাধন কতকটা আশ্বস্ত হল। সে ভাবলে, এর কাছ থেকেই আজকের রাতের আশ্রয় লাভের সমস্যাটা পূরণ করে নিতে পারবে।

কীভাবে কথাটা পাড়া যায় এই নিয়ে সে যখন মাথা ঘামাচ্ছে, তারাপদ তখন জিজ্ঞাসা করলে, হারাধনবাবু, আপনার কোথায় থাকা হয়?

হারাধন বললে, আপাতত আমি এইখানেই আছি?

লোকটি বিস্মিত স্বরে বললে, এইখানে মানে?

—আমি আজই প্রথম কলকাতায় এসে এইখানে বসেছি। কলকাতার কারুকে আমি চিনি না। এরপর কোথায় যাব, কোথায় ঠাই পাব, কিছুই জানি না।

—এর আগে আপনি কখনও কলকাতায় আসেননি?

—না।

—তবে এখানে কী করতে এসেছেন?

—বেড়াতে।

—খালি বেড়াতে? চাকরি-টাকরি করতে নয়?

হারাধন চুপ করে ভাবতে লাগল, এ-কথার কী জবাব দেওয়া উচিত। সে পাড়াগেঁয়ে লোক হলেও এইটুকু বুঝলে যে, নিজের কলকাতায় আসার আসল ইতিহাসটা যার-তার কাছে প্রকাশ করলে অত্যন্ত বোকামি আর ছেলেমানুষ করা হবে। তার চেয়ে একে যদি বলি— হ্যাঁ, একটা চাকরি পেলেও আমি করতে রাজি আছি, তাহলে সেটা নিতান্ত মন্দ শোনাবে না! আর সত্যি কথা বলতে কী, যদি কোনও ভালো, মনের মতো চাকরি অবলম্বন করেই কিছুদিন কলকাতায় কাটানো যায়, তাতেও তো আপত্তি করবার বিশেষ কারণ নেই!

অতএব হারাধন বললে, তারাপদবাবু, কলকাতায় আমি বেড়াতে এসেছি বটে, তবে মনের মতন কোনও কাজ পেলে চাকরি করতেও নারাজ নই।

তারাপদ হা হা করে হেসে তার পিঠে আস্তে একটা করাঘাত করে বললে,'ও, আপনি রথও দেখতে আর কলাও বেচতে চান? তা আমি আপনার একটা উপায় করে দিতে পারি?

হারাধন উৎসাহিত হয়ে বললে, পারেন? কিন্তু কী রকম চাকরি?

—আমার হাতে চাকরি আছে অনেক রকম। কিন্তু আপনি তো দেখছি বিশেষ ভদ্রলোক, চাকরি যদি করেন আপনাকে ভদ্রলোকের মতন চাকরি করতে হবে।

হারাধন জীবনে এই প্রথম শুনলে, তাকে কেউ ভদ্রলোক বলে সম্বোধন করছে। সে মনে মনে খুশি হয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভদ্রলোকেরই মতন চাকরি করতে চাই। তারাপদ একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, আপনি লেখাপড়া কতদূর শিখেছেন?

—এই বছরে ছাত্রবৃত্তি পাস করেছি।

তারাপদ উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, বহুৎ আচ্ছা, তাহলেই হবে! আমাদের জমিদারবাবুর একজন সহকারি ম্যানেজার দরকার। আজকেই আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই আপনি রাজি আছেন?

হারাধন খুব খুশি হয়ে বললে, নিশ্চয়ই আমি রাজি আছি। কিন্তু তার আগে আমাকে একটি বাসা ঠিক করে দিতে পারবেন?

তারাপদ বললে, আগে থাকতেই ও-ভাবনার দরকার নেই। জমিদারবাবু আপনাকে চাকরি দিতে যদি রাজি হন, তাহলে আজ থেকেই তো আপনি তার বাড়িতে থাকবার ঠাই পাবেন! কিন্তু আর একটি কথা আছে।

—বলুন।

—জমিদার-বাড়ির কাজে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে হয়। এখানে আপনাকে কেউ চেনে না, সুতরাং কেউ আপনার জন্যে জামিনও হতে পারবে না। কাজেই জমিদারবাবুর কাছে আপনাকে বোধহয় কিছু টাকা জমা রাখতে হবে।

হারাধন সরলভাবেই বললে, "বাবাকে চিঠি লিখলে পরে আমি আরও টাকা পেতে পারি বটে, কিন্তু আপাতত আমার কাছে দুশো টাকার বেশি নেই।

তারাপদ বললে, আমার বোধহয় জমিদারবাবু আপনার মতন ভদ্রলোকের কাছ থেকে খুব বেশি টাকা দাবি করবেন না। তাহলে উঠুন, আর দেরি করে কাজ নেই, আপনাকে একেবারে যথাস্থানেই নিয়ে যাই।

গোঁফের মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি

তারাপদর সঙ্গে ট্রামে উঠে হারাধন উত্তর-কলিকাতার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে নামল। তারপর পায়ে হেঁটে এ-গলি সে-গলি দিয়ে তারা মস্ত একখানা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় বসেছিল দারোয়ান, তারাপদকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম ঠুকলে। তারাপদর সঙ্গে সঙ্গে হারাধন বাড়ির ভিতরে ঢুকে খুব চওড়া এক কাঠের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে দোতলার একখানা প্রশস্ত ও আলোকিত হলঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

ঘরে ঢুকেই হারাধন হতভম্বের মতন হয়ে গেল। এতবড়ো হল এবং ঘরের এমন জমকালো সাজসজ্জা সে জীবনে আর কখনও দেখেনি।

উপরে বনবন করে ঘুরছে বৈদ্যুতিক পাখা এবং বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড়। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো বড়ো বড়ো আয়না ও ছবি। ঘরের মেঝে কাপেটে মোড়া। কার্পেটের উপরে আবার চাদর-ঢাকা নরম বিছানা পাতা। একদিকে ছোট্ট একখানি পালঙ্কের উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে একটি হোমরাচৌমরা গৌরবর্ণ ও মোটাসোটা লোক কোচকানো কাপড় ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন। তার হাতে আলবোলার রুপো বাঁধানো নল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার গোঁফজোড়া। গোঁফের দুই প্রান্ত ঝুলে এসে পড়েছে প্রায় তার কাঁধের কাছাকাছি। এত বড়ো গোঁফ হারাধন কখনও স্বপ্নেও দেখেনি। হলের কার্পেটের উপরে বিছানো বিছানায় বসে আছে আরও পনেরো-ষোলো জন লোক। তারাও কয়েকটি দলে বিভক্ত। কোনও দল খেলছে তাস, কোনও দল বসে বসে কৌতুহল ভরে খেলা দেখছে এবং কোনও দল তাকিয়ে আছে পালঙ্কের উপরকার বাবুটির দিকে তীর্থের কাকের মতন।

একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে হারাধন তার দৃষ্টিকে আবার নিবদ্ধ করলে পালঙ্কের উপরকার সেই আশ্চর্য গোফজোড়ার দিকে।

তারাপদ তার কানে কানে চুপি চুপি বললে, উনিই জমিদারবাবু, ওঁকে প্রণাম করো। হারাধন তার কথামতো কাজ করলে বটে, কিন্তু জমিদারবাবু না তার গোঁফজোড়া, কাকে নমস্কার করলে সেটা সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

জমিদারবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, কী হে তারাপদ, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? তারাপদ এগিয়ে গিয়ে বললে, আজ্ঞে, গোলদিঘিতে একটু হাওয়া খেতে গিয়েছিলুম।

—বেশ, বেশ! কিন্তু তোমার সঙ্গে ওই ছোকরাটি কে?

তারাপদ পালঙ্কের কাছে গিয়ে জমিদারবাবুর সঙ্গে অস্পষ্ট স্বরে কী কথা কইতে লাগল। হারাধন যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে সেই অদ্বিতীয় গোঁফজোড়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে দেখলে, তারাপদর কথা শুনতে শুনতে গোঁফজোড়া মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে এবং মাঝে মাঝে দুলে দুলে উঠছে। গোঁফ যে ফোলে আর গোঁফ যে দোলে, এটাও সে আগে জানত না।

তারপর হঠাৎ সে শুনলে ও দেখলে যে জমিদারবাবু তার দিকে তাকিয়ে দুই হাতে গোঁফের দুই প্রান্ত ধরে পাকাতে পাকাতে বললেন, ওহে ছোকরা, এদিকে এগিয়ে এসো তো।

গোঁফ থেকে চোখ না ফিরিয়েই হারাধন ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গুম্ফাধিকারী বললেন, তোমার নাম হারাধন পাল?

—আজ্ঞে হ্যা।

—তুমি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছ?

—আজ্ঞে হ্যা।

—তুমি এখানে চাকরি করতে চাও?

হারাধনের সেই একই উত্তর-আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার কত মাইনে হবে জানো?

—আজ্ঞে না।

—মাসে দেড়শো টাকা। এক বছর কাজ করলে আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়বে।

হারাধন এতটা আশা করেনি। এবারে সে একেবারে বোবা হয়ে রইল।

গুম্ফধারী বললেন, কিন্তু এ-বড়ো দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তোমার হাত দিয়ে অনেক টাকা যাবে আর অনেক টাকা আসবে। তোমাকে বিশ্বাস কী? কেউ তোমার জামিন হবে?

হারাধন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, আজ্ঞে, কাজটি পেলে আমি দুশো টাকা জমা রাখতে রাজি আছি।

গোঁফ ফুলিয়ে জমিদারবাবু বললেন, ফুঃ! দুশো টাকা আবার টাকা নাকি? এক-একদিন তোমার কাছে থাকবে আমার তিন-চার হাজার টাকা। তোমার দুশো টাকা জমা রেখে আমি কী করব?

হারাধন বললে, আজ্ঞে—

গোঁফের দুই প্রান্তে আঙুল বুলোতে বুলোতে জমিদারবাবু তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, ও আজ্ঞে-টাজ্ঞে চলবে না বাপু! তারাপদর অনুরোধে আমি তোমাকে চাকরি দিতে রাজি আছি বটে, কিন্তু তোমাকে জমা রাখতে হবে অন্তত এক হাজার টাকা।

হারাধন হতাশভাবে বললে, আজ্ঞে, অত টাকা তো আমার কাছে নেই!

এইবারে এক পায়ের উপর আর এক পা দিয়ে নিজে দুলতে দুলতে এবং গোঁফ জোড়াকেও দোলাতে দোলাতে জমিদারবাবু বললেন, তাহলে পথ দ্যাখো বাপু, এখান থেকে সরে পড়ো।

হারাধন ফিরে নিরাশ চোখে তারাপদর দিকে তাকালে। তারাপদ তাকে হাত ধরে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে তার কানে কানে বললে, হারাধনবাবু, আপনি এত বোকা কেন? এই না খানিক আগে আপনি আমাকে বললেন, বাড়িতে চিঠি লিখলেই আপনার বাবা টাকা পাঠিয়ে দেবেন?

হারাধন ম্রিয়মাণভাবেই বললে, কিন্তু এক হাজার টাকা?

তারাপদ বললে, শুনলেন তো, এক বছর পরেই আপনার দুশো টাকা মাইনে হবে! আজকাল বড়ো বড়ো এম-এ, বি-এ পাস করা ভদ্রলোকেরও একশো টাকার চাকরি জোগাড় করতে জিব বেরিয়ে পড়ে। জমিদারবাবু আপনাকে চাকরি দিতে রাজি হয়েছেন খালি আমার কথাতেই তো? এমন চাকরির জন্যেও আপনার বাবা হাজার টাকা জমা রাখতে পারবেন না?

হারাধন ভাবতে ভাবতে বললে, তা পাঠালেও পাঠাতে পারেন। কিন্তু বাবার মত না জেনে কেমন করে আমি কথা দিই?

তারাপদ বললে, আমি বলছি আপনার বাবার মত হবেই। তাহলে আপনি এইখানেই দাঁড়ান, আমি জমিদারবাবুকে বলে আসি, আপনি হাজার টাকা দিতেই রাজি আছেন।

তারাপদ আরার এগিয়ে গিয়ে জমিদারবাবুর কানে কানে ফিসফিস করে কী বললে হারাধন তা শুনতে পেলে না বটে, কিন্তু এটা দেখতে পেলে যে তার গোফ-জোড়া আবার ফুলে এবং দুলে উঠল। সে আন্দাজ করলে জমিদারবাবুর যত ভাবের অভিব্যক্তি হয় ওই গোঁফ-জোড়ার দ্বারাই।

তারাপদ ফিরে হাসতে হাসতে বললে, হারাধনবাবু, আপনাকে চাকরিতে গ্রহণ করা হল। আসুন, এগিয়ে আসুন, আপাতত দুশো টাকা এইখানে জমা রাখুন।

হারাধন পালঙ্কের কাছে গিয়ে জমিদারবাবুর সামনে কুড়িখানি দশ টাকার নোট স্থাপন করলে।

জমিদারবাবু সেদিকে ফিরেও না তাকিয়ে ডাকলেন, নিমাই! কার্পেটের উপর উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ্ঞে হুজুর! জমিদারবাবু বললেন, আজ থেকে এইখানেই হারাধনবাবুর শোবার ও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি একে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

নিমাইয়ের পিছনে পিছনে হারাধন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জমিদারবাবু বললেন, এ-জীবটিকে কোথায় জোগাড় করলে তারাপদ?

তারাপদ একগাল হেসে বললে, ঠিক জোগাড় করতে হয়নি বাবু! ধরতে গেলে ও একরকম যেচেই আমাদের জালে এসে ধরা দিয়েছে। মনে হল ওর ভেতরে কিছু শাঁস আছে, তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

বাবু বললেন, দেখলে তো মনে হয় না শসালো মাল। দুশো টাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু হাজার টাকা কি ছাড়তে পারবে?

—সে খোঁজ না নিয়ে কি ওকে সঙ্গে এনেছি? ব্যাটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, শহরে এসেছে বাবুগিরি শেখবার জন্যে! পথে আসতে আসতে ঠারে-ঠোরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, ছোড়ার বাপের হাতে কিছু টাকা আছে। খালি হাজার

টাকা কেন, আমার বিশ্বাস, নানা অছিলায় ওর কাছ থেকে আরও বেশ কিছু আদায় করতে পারব।

বাবু তখন প্রসঙ্গ বদলে বললেন, কিন্তু তারাপদ, ওদিকের খবর শুনেছ কি?

—কোন খবর?

—রতন রায়ের মেয়ের? তুমি জানো, রতন রায়ের মেয়ে কী ছেলেকে ধরে আনবার জন্যে শম্ভু আর পঞ্চুকে পাঠিয়েছিলুম? হতভাগারা সব-কাজ পণ্ড করে ফিরে এসেছে।

—পণ্ড করে ফিরে এসেছে?

—হাঁ। শুনলুম মেয়েটাকে ওরা ভুলিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু পথে আসতে আসতে গাধারা লোভ সামলাতে না পেরে মেয়েটার গা থেকে গয়না খুলে নিতে গিয়েছিল, মেয়েটা চ্যাঁচামেচি করে, আর তার চিৎকার শুনে কোথা থেকে কে একটা লোক এসে শম্ভুকে আর পঞ্চুকে এমন উত্তম-মধ্যম দিয়েছে যে, উল্লুকরা পালিয়ে আসবার পথ পায়নি! নচ্ছাররা ঘাটে এনে নৌকো ডুবিয়েছে, ওদের আর কোনও কাজে পাঠানো হবে না। তারাপদ সখেদে বললে, হায় হয়, এমন দাঁও ফসকে গেল! রতন রায় মস্ত বড়োলোক, মেয়েটাকে কিছুদিন ধরে রাখতে পারলে তার কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা আদায় করা চলত!

বাবু বললেন, কিন্তু আমি এখনও হাল ছাড়িনি তারাপদ রতন রায়ের পেছনে আবার লোক লাগিয়েছি, হয় তার মেয়ে, নয় তার ছেলেকে আমার চাইই চাই।

তারাপদ বললে, কিন্তু বাবু, মাছ একবার ছিপের সুতো ছিড়ে পালালে আর কি টোপ গেলে? রতন রায় নিশ্চয় খুব সাবধান হয়েই থাকবে।

—তবু দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

হারাধন বাবাকে চিঠি লিখলে

হারাধন তার বাবাকে এই পত্রখানি লিখলে

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়

বাবা,

আপনাকে প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, আমি নিরাপদে কলিকাতা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনি শুনিলে হয়তো বিশ্বাস করিবেন না যে, পথে আসিতে আসিতেই এক বিখ্যাত ব্যারিস্টার সাহেবের সহিত আমার অত্যন্ত আলাপ হইয়াছে। তাঁহার বাড়িতে আমি তিন দিবস জামাই-আদরে বাস করিয়াছিলাম। পরে যথাসময়ে সেই বিবরণ আপনাকে জ্ঞাত করিব।

আপনাকে আর-একটি সুসংবাদ প্রদান করিতে চাহি। আপনি শুনিলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন যে, কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া প্রথম দিবসেই আমি এক অতিশয় অর্থশালী জমিদারের বাড়িতে ম্যানেজারের পদ লাভ করিয়াছি। বেতন এখন মাসিক দেড়শত মুদ্রা, এক বৎসর পরে মাহিনা বাড়িয়া দুইশত মুদ্রা হইবে।

আমি যে-জমিদারের আশ্রয়ে এখন বাস করিতেছি, তাহার তুলনায় আমাদের দেশের জমিদার অতিশয় ক্ষুদ্র। কিন্তু আমাদের সেই জমিদারের ম্যানেজার তো দূরের কথা, গোমস্তা ও বাজার-সরকারদেরও তো আপনি অবগত আছেন? তাহারাও আমাদের। কীটপতঙ্গের মতো বলিয়া বিবেচনা করে এবং সর্বদাই চাষার ছেলে বলিয়া অপমান করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আমি রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে এ-হেন বৃহৎ জমিদারের আলয়ে এত টাকা মাহিনায় ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি শুনিয়া এইবারে তাহারা কী বলে তাহা অবগত হইবার জন্য আমার অতিশয় আগ্রহ হইতেছে।

আপনার পদ-বন্দনা করিব এবং আমাদের দেশস্থ জমিদারবাটির কুকুর ও টিকটিকিদের পর্যন্ত বুঝাইয়া দিয়া আসিব যে, আমি আর চাষার ছেলের মতো তুচ্ছ নহি, আমি এখন রীতিমতো শহুরে বাবু হইয়া উঠিয়াছি, এমনকী কলিকাতার বড়ো বড়ো ভদ্রলোকরা অবধি আমাকে এখন বাবু বলিয়া সম্বোধন করে।

কিন্তু আপনার নিকটে আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। কলিকাতায় আমার জামিন হইবার মতো লোক কেহ নাই। অথচ জমিদারবাবুর হাজার হাজার মুদ্রা লইয়া আমাকে নাড়াচাড়া করিতে হইবে। আমার চাকুরি হইয়াছে এবং আমি জমিদারবাবুর আশ্রয়েও বাস করিতেছি বটে, কিন্তু এক সহস্র মুদ্রা জমা না রাখিলে আমার ভাগে এ-চাকুরিটি টিকিবে না। ইতিমধ্যেই আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই দুইশত মুদ্রা আমি জমিদারবাবুর নিকট জমা রাখিয়াছি। অতঃপর আপনার শ্রীচরণে নিবেদন এই যে, পত্রপ্রাপ্তিমাত্র আপনি বক্রী আটশত মুদ্রা আমার নিকটে ডাকযোগে পাঠাইয়া দিবেন।

ভুলো কুকুরটাকে প্রতি দিবস যেন পাতের ভাত খাইতে দেওয়া হয়। ভুলো কি আমার অদর্শনে বড়োই ক্রন্দন করিতেছে? মেনির বাচ্চাগুলো আরও কত বড়ো হইয়াছে? আমার বোমা লাটাইটা ভুলিয়া ছাদের উপরে ফেলিয়া আসিয়াছি, মাতাঠাকুরানি তাহা যেন তুলিয়া রাখিয়া দেন। আমার ভ্রাতৃগণ যেন আমার মার্বেল ও লাটু প্রভৃতিতে হস্তাপর্ণ না করে। এসব বিষয়ের উপরে আপনিও অনুগ্রহ করিয়া কিছু কিছু দৃষ্টিপাত করিবেন।

এখানকার সমস্ত কুশল। আপনাদের কুশল-সংবাদ দিয়া সুখি করবেন। আপনি এবং মাতাঠাকুরানি আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করবেন। ভ্রাতৃগণকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। আজ তবে আসি। ইতি–

সেবক

শ্রীহারাধন পাল

চিঠিখানি দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীমান হারাধন দিনকয়েক নিশ্চিন্ত হয়ে জমিদারবাবুর বাড়ির অন্ন ধ্বংস করে কলকাতার পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল। হপ্তাখানেকের মধ্যেই কলকাতার অনেক বিশেষত্বের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। একদিন থিয়েটার ও দুদিন বায়োস্কোপ পর্যন্ত সে দেখে ফেললে। জাদুঘর ও চিড়িয়াখানাতেও ঘুরে আসতে ভুললে না। এমনকী মোটরগাড়ির মারাত্মক আক্রমণ হতে কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয় সে-কায়দাটাও শিখে ফেললে খুব চটপট।

আমাদের হারাধন বোকা না হলেও একে অজ পাড়াগেঁয়ে ছেলে, তার উপরে বয়সে বালক এবং পৃথিবী ও সংসারের কোনও অভিজ্ঞতাই তার নেই। সে আন্দাজ করতে পারেনি যে, তার মতন একজন অল্পশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ বালককে কলকাতার কোনও অতি নির্বোধ জমিদারও দেড়শো দুইশো টাকা মাহিনায় কোনও কাজে নিযুক্ত করতে পারে না। তাই সে রীতিমতো মূর্খের স্বর্গে বসে দিবা-স্বপ্ন দেখতে দেখতে আকাশে প্রাসাদ নির্মাণ করতে লাগল।

কিন্তু কোনও কোনও ব্যাপার তার চোখেও ঠেকল কেমন যেন বিসদৃশ। এমন মস্ত অট্টালিকা, কিন্তু এ যেন একটা প্রকাণ্ড মেসবাড়ির মতো। এর মধ্যে চল্লিশপঞ্চাশজন লোক বাস করে, কিন্তু তারা সবাই পুরুষমানুষ। এ-বাড়ির ভিতরে অন্তঃপুর বলে কোনও জায়গা নেই। বাসিন্দাদের অনেকেরই চেহারা, কথাবার্তা ও ব্যবহারও ঠিক ভদ্রলোকের মতো নয়, বরং তার উলটো। অনেকে আবার প্রকাশ্যেই মদ বা গাঁজা খায়, জমিদারবাবু স্বচক্ষে দেখেও কিছু বলেন না। অনেকেরই পকেটে সর্বদাই ছোরা বা বড়ো বড়ো ছুরি থাকে।

হারাধন ভাবলে, হয়তো কলকাতার জমিদারদের হালচালই এইরকম। দিন-সাতেক পরে হারাধন একদিন সিঁড়ির সামনে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ সিঁড়ির উপরে চার-পাঁচজন লোকের পায়ের শব্দ হল।

কচি কচি গলায় কোনও শিশু কেঁদে বললে, কই, আমার বাবা কই? আমি বাবার কাছে যাব।

কে একজন বললে, তোমার বাবা ওপরে আছেন, দেখবে চলো। তারপরেই জন-চারেক লোক দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তাদের একজনের কোলে একটি শিশু। লোকটা শিশুকে নিয়ে দ্রুতপদে তেতলার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।

কিন্তু হারাধন এর মধ্যেই শিশুর মুখ দেখতে পেয়েছিল। কী আশ্চর্য, তাকে দেখতে যে অবিকল মিঃ রায়ের ছেলে বিমানকুমারের মতো!

তারাপদ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। সে শুধোলে, কী হে হারাধন, তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?

হারাধন বললে, ওই খোকাটিকে আমি চিনি।

তারাপদ সবিস্ময়ে বললে, ওই খোকাকে তুমি চেনো?

—হ্যাঁ।

—ও কে বলো দেখি?

—মিঃ রতন রায়ের ছেলে বিমান।

—রতন রায়কে তুমি চিনলে কেমন করে?

—কলকাতায় আসবার আগে আমি তার বাড়িতে তিনদিন ছিলুম।

—আর সেইখানেই তুমি.ওই খোকাকে দেখেছ?

—হ্যাঁ। বিমান আমাকে নতুন দাদা বলে ডাকে।

—হারাধন, তুমি আস্ত পাগল।

—কেন?

—সহজ মানুষের কখনও এমন চোখের ভুল হয় না।

—আমার কি ভুল হয়েছে?

—ওই খোকাটি হচ্ছে আমাদের বাবুর নিজের ছেলে। অসুখ হয়েছে বলে চিকিৎসার জন্যে ওকে কলকাতায় আনা হয়েছে।

হারাধন হতভম্ব হয়ে গেল। এমন অদ্ভুত চেহারার মিল কি হয়? সেই চুল, সেই কোঁকড়া চুল, সেই জোড়া ভুরু, সেই নাক, সেই ঠোঁট–এমনকী সেই গায়ের রং! একেবারে বিমানের প্রতিমূর্তি।

সে বললে, এ যে অবাক কাণ্ড! আমাকে একবার খোকার কাছে নিয়ে চলুন, আমি আর একবার ভালো করে দেখব।

—কী ভালো করে দেখবে?

—ওই খোকাটি বিমান কি না?

তারাপদ ক্রুদ্ধ, কর্কশ কণ্ঠে বললে, আবার ওই কথা! আমাদের বাবুর ছেলেকে আমি চিনি না? না, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না, বাবু রাগ করবেন!

—রাগ করবেন! কেন?

—অচেনা লোক দেখলে ভয় পেয়ে খোকার অসুখ বাড়তে পারে।

—আমি কি রাক্ষস যে আমাকে দেখে খোকা ভয় পাবে?

—দ্যাখো বাপু, তোমার অত কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। তুমি হচ্ছ কর্মচারী, মনিবদের ঘরোয়া কথা নিয়ে তুমি যদি এখন থেকেই মাথা ঘামাতে শুরু করো, তাহলে এবাড়িতে আর তোমার ঠাঁই হবে না? বলতে বলতে তার মুখের উপরে এমন একটা কঠিন ও কুৎসিত ভাব ফুটে উঠল, এর আগে হারাধন যা আর কখনও লক্ষ করেনি!

সে আস্তে-আস্তে সরে পড়ল এবং যেতে যেতে শুনতে পেলে তারাপদ আবার বললে, যারা নিজের চরকায় তেল দেয় না, তাদের সঙ্গে আমরা কোনও সম্পর্ক রাখি না!

হারাধন কিছুতেই বুঝতে পারলে না, তার অপরাধ হয়েছে কোনখানে অবাক হয়ে ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ক্রমাগত।

ওদিকে জমিদারবাবু তখন বৈঠকখানায় বসে আছেন আলবোলার নলটি হাতে করে। হঠাৎ শম্ভু এসে ঘরে ঢুকল, তার মুখের ভাব উদ্বিগ্ন। বাবু শুধোলেন; কিরে শম্ভা, এতদিন তুই কোথায় ছিলি? আর তোর মুখখানাই বা এমন জাম্ববানের মতন হয়েছে কেন?

জাম্বুবান যে কী জীব এবং তার মুখের ভাব যে কী-রকম, অত খবর শম্ভু রাখত না।

সে-সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে বললে, বাবু, যে-ছোকরাটাকে আপনি এখানে ঠাই দিয়েছেন, সে কে?

—অত খবরে তোর দরকার কী?

—আমি আজ এখানে এসেই ওকে চিনতে পেরেছি!

—কী চিনতে পেরেছিস ; ও তোর মামা, না শ্বশুর।

—না বাবু, ঠাট্টা নয়! ওই ছোড়াই লাঠি চালিয়ে রতন রায়ের মেয়েকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল!

বাবু ভয়ানক চমকে উঠলেন। তার হাত থেকে তামাকের নলটা খসে পড়ে গেল। একটু ভাববার পর একটু হেসে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, দূর, তাও কখনও হয়? ওই তো একফোটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, এখনও ওর গাল টিপলে দুধ বেরোয়, ও কখনও একলা লাঠি চালিয়ে তোদের মতন দু-দুটো হাড়-পাকা পুরোনো পাপীকে খেদিয়ে দিতে পারে। তোর রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে?

—কক্ষনো নয়! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি ও হচ্ছে সেই ছোকরাই!

—কেন বাজে বকচিস!

—আমি খাঁটি কথাই বলছি।

এমন সময়ে তারাপদর প্রবেশ।

বাবু বললেন, ওহে তারাপদ, শম্ভু আবার কী বলে শোনো।

—তুই আবার কী সমাচার এনেছিস রে?

শম্ভু সব বললে। তারাপদ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগল।

বাবু বললেন, কী তারাপদ, তুমি আবার চিন্তা-নদে ঝাঁপ দিলে কেন?

—আজ্ঞে বাবু, শম্ভুর চোখ বোধহয় ভুল দেখেনি।

—বলো কী হে?

—হারাধনই বোধহয় শম্ভু আর পঞ্চুকে ধনঞ্জয় দান করেছে। রতন রায়কে সে চেনে। আজ এখানে রতন রায়ের ছেলেকে দেখেও সে চিনে ফেলেছে!

—কী সর্বনাশ!

—আমাকে সে অনেক কথা জিজ্ঞাসাও করছিল।

—তবেই তো! হারাধন বেটা নিশ্চয়ই পুলিশের চর!

—বোধহয় নয়। আমার বিশ্বাস, রতন রায়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে দৈবগতিকে।

দুই হাতে নিজের সুদীর্ঘ গোঁফের দুই প্রান্ত ধারণ করে বাবু বললেন, এই গুরুতর ব্যাপারটাকে তুমি এত সহজে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না তারাপদ! হারাধন পুলিশের চর হোক আর না হোক, সে যখন এত খবর রাখে তখন তার মুখবন্ধ করতেই হবে!

—কেমন করে?

—যেমন করে আমরা লোকের মুখবন্ধ করি।

—ওকে খুন করবেন?

—নিশ্চয়!

—তাহলে ওর কাছ থেকে আর টাকা আদায় হবে না।

—বয়ে গেল! তুমি কি বলতে চাও ওর কাছ থেকে দু-চার হাজার টাকা পাওয়ার লোভে আমরা রতন রায়ের মতন এত বড়ো শিকারকে হাত-ছাড়া করব? তারপর তুমি আর একটা কথা ভেবে দেখছ না, ওই ছোড়া পুলিশের চর না

হলেও যদি কিছু সন্দেহ করে পুলিশে খবর দেয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে দড়ি পড়বে তা জানো?

—বাবু, আমার বিশ্বাস আপাতত হারাধনের সন্দেহ আমি দূর করতে পেরেছি। আমি কী বলি জানেন? আগে ওকে ভালো করে নিংড়ে সব রস বার করে নিই, তারপর যা-হয় একটা ব্যবস্থা করলেই চলবে।

—বেশ, যা ভালো বোঝো করো। তবে এক বিষয়ে খুব সাবধানে থেকে। হারাধনকে নজরবন্দি করে রেখো, ও বাড়ি থেকে বেরুলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে লোক থাকে–কোথায় যায়, কী করে দেখবার জন্যে। কেন জানি না তারাপদ, আমার মেজাজটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। বলতে বলতে বাবুর গোঁফজোড়া মুখের দুই দিকে ঝুলে পড়ল। অন্যমনস্কের মতন তিনি আবার তামাকের নলটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন।

জনার্দন সিঁড়ি জুড়ে বসে থাকে

কলকাতায় এসে হারাধনের নতুন একটি শখ হয়েছিল।

সে দেখলে, কলকাতার লোকেরা লাইব্রেরিতে, চায়ের দোকানে বা বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পাঠ করে। এটা শহুরে ভদ্রলোকের অন্যতম প্রধান লক্ষণ স্থির করে সেও প্রত্যহ একখানি করে বাংলা দৈনিকপত্র কিনতে আরম্ভ করেছে। আজও সে বাসায় যাবার সময় একখানি বাংলা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে চৌকির উপরে শুয়ে সে খবরের কাগজখানি খুললে। প্রথমে অন্যান্য খবর এবং সম্পাদকীয় টীকা-টিপ্পনী খানিক বুঝে এবং খানিক না বুঝে পাঠ করলে। তারপর দৃষ্টিপাত করলে বিজ্ঞাপন বিভাগের উপরে।

সংবাদপত্রের মধ্যে তাকে সব-চেয়ে বেশি আকর্ষণ করত এই বিজ্ঞাপন-বিভাগটি। খবরগুলো তো প্রায়ই হয় একঘেয়ে–কোথায় কোন সভা হয়েছে তারই বিবরণ ও বড়ো বড়ো নামের ফর্দ, কোথায় কে মোটর বা লরি চাপা পড়ে পটল তুলেছে, কোথায় কে দশ পয়সার জিনিস চার আনায় বেচে আদালতে গিয়ে জরিমানা দিয়ে এসেছে, যুদ্ধক্ষেত্রের কোথায় জার্মানি পঞ্চাশ পা এগিয়ে এসেছে এবং মিত্রশক্তিরা প্রবল আক্রমণ করেও সাড়ে-বত্রিশ পা পিছিয়ে পড়েছে, এই তো হচ্ছে প্রতিদিনকার এক-রকম পঁচা পুরাতন টাটকা খবর।

কিন্তু বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে দাখো! তার সর্বত্রই অফুরন্ত বৈচিত্র্য! কেউ দিতে রাজি তিন টাকায় চূড়ান্ত বাবুয়ানার পুরো সাজসজ্জা! কোনও পরম উদার ব্যক্তি মাত্র চার আনা পাঠিয়ে দিলেই এক ভরি সুবর্ণ বিতরণ করবেন! বরেরা অন্বেষণ করছেন গানে-নাচেবিদ্যায় ও রূপে শ্রেষ্ঠ কন্যাদের! জ্যোতিষীরা সগর্বে প্রচার করছেন, তাদের একখানি মাত্র কবচ কিনলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সমস্তই একসঙ্গে লাভ করা যেতে পারবে! তথাকথিত চিকিৎসকরা ভরসা দিচ্ছেন

তাদের পেটেন্ট ঔষধ একমাত্রা সেবন করলেই পূর্বজন্মেরও সমস্ত ব্যাধি থেকে রোগীরা আরোগ্যলাভ করবেন! কেউ কেউ অশীতিপর বৃদ্ধদেরও জানিয়ে দিচ্ছেন, সন্ন্যাসীদের কাছে প্রাপ্ত দ্রব্যবিশেষের গুণে তাঁরা প্রত্যেকেই আবার দেখতে হবেন নব-যুবকের মতো। এমনি আরও কত ব্যাপার।

হারাধন বিস্ফারিত নেত্রে বিপুল আগ্রহভরে প্রায় শ্বাস রোধ করেই এইসব বিজ্ঞাপন পড়তে ভালোবাসত।

সেদিন বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার দিকে চেয়ে সর্ব-প্রথমে এই বিষয়টি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল:

আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান বিমানকুমার রায়কে গত শনিবার হইতে আর পাওয়া যাইতেছে না। হয় সে হারাইয়া গিয়াছে, নয় কেহ তাহাকে মন্দ অভিপ্রায়ে চুরি করিয়াছে। শ্রীমান বিমানের বয়স সাত বৎসর। তাহার বর্ণ গৌর, মাথায় দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম, জোড়া ভুরু, মুখশ্রী সুন্দর। তাহার পরিধানে ছিল লাল রঙের পোশাক। যে-কোনও ব্যক্তি তাহার সন্ধান আনিতে পরিবেন, তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনের নীচে মিস্টার রায়ের নাম ও ঠিকানা।

হারাধন বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসল। গতকল্য সে এখানেই হুবহু বিমানের মতন দেখতে একটি শিশুর দেখা পেয়েছে–তারাপদ যাকে জমিদারবাবুর ছেলে বলে পরিচয় দিলে। আজ মিস্টার রায়ের নামে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করেই তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, কাল সে যাকে দেখেছে সে বিমান ছাড়া আর কেউ নয়! তার কিছুমাত্র ভুল হয়নি, পুরো তিনদিন যাকে নিয়ে সে এত খেলেছে, এর মধ্যেই তার চেহারা কি ভুলে যেতে পারে? হ্যাঁ, ওই খোকাটিই হচ্ছে বিমানকুমার।

কিন্তু বিমান এখানে এসেছে কেন? কিংবা মিস্টার রায় বিজ্ঞাপনে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, সেইটেই কি সত্য? বিমানকে কেউ কি চুরি করে এখানে নিয়ে এসেছে? কিন্তু কেন?

হারাধন কিছুতেই মনের ভিতর থেকে এই 'কেন'র জবাব পেলে না। তার মনের ভিতরে আরও অনেক 'কেন' জাগতে লাগল। তারাপদ তার কাছে মিছে কথা বললে কেন? বিমানকে সে জমিদারবাবুর ছেলে বললে কেন? আর জমিদারবাবুই বা পরের ছেলে বিমানকে চুরি করে নিজের বাড়িতে এনে রাখবেন কেন?

এইসব 'কেন'র কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না! ভেবে হারাধনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যেতে লাগল, সে হতাশভাবে শেষটা কার্য ও কারণের সম্পর্ক আবিষ্কার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে তারাপদ বললে, কী হে হারাধন, তুমি যে পাকা কলকাতার বাবু হয়ে উঠলে দেখছি!

পাছে বিজ্ঞাপনটা তার চোখে পড়ে সেই ভয়ে হারাধন খবরের কাগজখানা মুড়ে ফেলে জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, কেন বলুন দেখি?

—আজকাল রোজ খবরের কাগজ না পড়লে তোমার পেটের ভাত হজম হয় না বুঝি?

—আজ্ঞে না তারাপদবাবু, আপনারা তো এখনও আমাকে কোনও কাজে বহাল করলেন না, সময় কাটাবার জন্যে একলা বসে বসে কী আর করি বলুন?

—তাই বুঝি যত সব বাজে বুটা খবর পড়বার জন্যে মিছে পয়সা খরচ করে মরছ?

—নাটক-নভেলেও সত্যিকথা তো থাকে না তারাপদবাবু, তবু তো লোকে নাটক-নভেল কেনবার জন্যে পয়সা খরচ করে!

তারাপদ তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, বা-বা, আমাদের হারাধন যে বচন আওড়াতেও শিখেছে! এটা কি কলকাতার হাওয়ার গুণ?

হারাধন জবাব না দিয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, আচ্ছা তারাপদবাবু, আমাকে আপনারা এমন অলসভাবে বসিয়ে রেখেছেন কেন? আমার চাকরি হয়েছে, মাসে মাসে আপনারা মাইনে দেবেন, তবু আমার হাতে আপনারা কোনও কাজ দিচ্ছেন না কেন?

তারাপদ গম্ভীর হয়ে বললে, আমি সেই কথাই বলতে এসেছি। তোমার বাবা চিঠির কোনও জবাব দিয়েছেন?

—না এখনও কোনও জবাব পাইনি।

—আমার বোধহয় তোমার বাবা টাকা পাঠাতে রাজি নন।

হারাধন হেসে মাথা নেড়ে বললে, আপনি আমার বাবাকে জানেন না বলেই এই কথা বলছেন। বাবা আমাকে এত ভালোবাসেন যে আমার উন্নতির জন্যে সব করতে রাজি হবেন। দেখুন না, দু-একদিনের মধ্যেই একেবারে মনিঅর্ডারে বাবার টাকা এসে পড়বে।

—হ্যা,এসে পড়াই ভালো। কারণ বাবু বলছিলেন, এই হপ্তার ভেতরেই যদি তোমার টাকা না আসে, তাহলে তাকে নতুন লোক দেখতে হবে। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তোমাকে চাকরি দিতে পারবেন না, আর এদিকে লোকের অভাবে তার জমিদারির কাজে বড়েই ক্ষতি হচ্ছে। আমি কী বলি জানো হারাধন? তুমি আজই বাবাকে একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও।

—আচ্ছা, কালকের দিনটা পর্যন্ত দেখে বাবাকে টেলিগ্রামই করব।

—বেশ, তাই কোরো। তবে কাজটা আজ করলেই ভালো হত। বলতে বলতে তারাপদ আবার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরা টাকার জন্যে হঠাৎ এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন, হারাধন সে-রহস্যও বুঝতে পারলে না। এই জমিদারবাবুটা যে পৃথিবীর দশ হাত মাটিরও

অধিকারী নন, তিনি যে কলকাতার একজন গুণ্ডা, খুনি ও ডাকাতদের বড়ো সর্দার, হারাধন এ-সত্যটা এখনও আন্দাজ করতে পারেনি। আপাতত ওই হাজার টাকা হস্তগত করতে পারলেই সর্দারজি যে নিরাপদ হবার জন্যে দুনিয়ার খাতা থেকে তার নাম একেবারে লুপ্ত করে দিতে চান, এটা ধরতে পারলে হারাধনের পিলে যে কতখানি চমকে যেত, আমরা তা বলতে পারি না। কিন্তু এখন তার মন সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে বিমানের চিন্তায়। কারণ অন্তত এইটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে, কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিমানকে এইখানে নিয়ে আসা হয়নি। মফস্বলে সে ধনীদের মধ্যে পারিবারিক শত্রুতার অনেক কাহিনি শ্রবণ করেছে। সেখানে প্রতিহিংসার খাতিরে অনেক খুন-খারাপ পর্যন্ত হয়ে গেছে। মিস্টার রায়ের সঙ্গে জমিদারবাবুর নিশ্চয়ই কোনও শত্রুতার সম্পর্ক আছে। বোধহয় মিস্টার রায়ের একমাত্র পুত্র বিমানকে হরণ করে তিনি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চান। হারাধন নিজের বুদ্ধিতে এইটুকু পর্যন্ত অনুমান করতে পারলে।

তখন সে ভাবতে লাগল, এখন আমার কর্তব্য কী? চাকরির মায়া ছাড়ব? বিমানকে উদ্ধার করব? বিমান হচ্ছে মিস্টার ও মিসেস রায়ের বড়ো আদরের নিধি, তারা কিছুক্ষণের জন্যেও তাকে চোখের আড়ালে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। ছেলের অভাবে না জানি এতক্ষণে র্তারা কতই কষ্ট পাচ্ছেন। মিসেস রায় হয়তো আহার-নিদ্রা ছেড়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন! তাদের কাছ থেকে এই অল্প-পরিচয়েই সে কতখানি আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা লাভ করেছে। সব জেনেশুনেও সে কি এখনও হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকবে? তাহলে সে কি ভগবানের অভিশাপ কুড়োবে না?

হারাধন উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর দোতলার বারান্দার যেখান থেকে তেতলার সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে, পায়ে পায়ে সেইদিকে হল অগ্রসর।

তেতলার সিঁড়ির নীচের ধাপেই যে-লোকটা বসেছিল তার নাম হচ্ছে জনার্দন। লোকটার চেহারাই কেবল যমদূতের মতন নয়, তার কথাবার্তাগুলোও রীতিমতো কাটখোট্টার মতো। হারাধন হাসিমুখে বললে, কী জনার্দনবাবু, কখন থেকে দেখছি আপনি এই সিঁড়ি জুড়েই বসে আছেন, বাড়িতে এত ভালো ভালো ঘর থাকতে সিঁড়ির ওপর ধুলোয় বসে কেন? অকারণেই তেলে-বেগুনের মতন জ্বলে উঠে জনার্দন মুখ খিঁচিয়ে বললে, সে-খবরে তোমার দরকার কী হে ছোকরা?

হারাধন বললে, না ভাই, দরকার কিছু নেই, কথার কথা জিজ্ঞাসা করছি আর কী! সিঁড়ির ওপর এমনভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তো?

জনার্দন হুমকি দিয়ে বললে, হেঃ, কষ্ট হচ্ছে! না, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না! ভালো চাও তো এখান থেকে মানে মানে সরে পড়ো!

—কেন ভাই, তুমি যে দেখছি একেবারে মারমুখো হয়ে আছ! এখানে এসে আমি কী দোষ করলুম? দুটো গল্প করছি বই তো নয়?

—না, না, এটা তোমার গল্প করবার বা বেড়াবার জায়গা নয়! বাবুর হুকুম পেয়েছি, এদিকে কেউ এলেই তাকে গলাধাক্কা দিতে হবে! এখান থেকে যাবে, না গলাধাক্কা খাবে? হারাধন আর-কিছু বললে না। বিস্মিত হয়ে এই ভাবতে ভাবতে ফিরে এল, জমিদারবাবু হঠাৎ এমন কড়া হুকুম দিলেন কেন? পাছে বিমানকে কেউ দেখতে পায়, সেইজন্যেই কি এই সাবধানতা? তাহলে জনার্দনকে ওখানে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছে? নাঃ, ব্যাপারটা ক্রমেই বেশি রহস্যময় হয়ে উঠছে–এইবারে দেখা দরকার এই রহস্যের শেষ কোথায়?

রেড়ির তেল ভারী ভালো জিনিস

ঢং!...রাত্রি একটা। সারা কলকাতা ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি মানুষরা নয়, ঘুমোচ্ছে যেন বাড়িগুলোও! কোনও বাড়ির ভিতর থেকে একটাও শব্দ নির্গত হচ্ছে না। ঘুমোচ্ছে যেন রাজপথগুলোও।

ষষ্ঠীর চাঁদের তিলকও মুছে গিয়েছে আকাশের কপাল থেকে তারাগুলো যেন উর্ধ্বলোকের স্থির জোনাকির আলো। বিশ্বের সবাই যখন নিদালী-মন্ত্রে অচেতন, তখন তাদের আসে রাত জাগবার পালা।

দুনিয়ার এত লোকের মধ্যে আমাদের দরকার এখন হারাধনকে। সে এখন কী করছে? স্বপ্নদর্শন? দেখা যাক।

দরজায় কান পাতলে বুঝবে, তার নাসিকা এখন গর্জন করছে না! আর দরজার ফাঁকে উঁকি মারলে দেখবে, সে এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি।

তবে এত রাত্রে কী করছে সে? দিচ্ছে ডন, দিচ্ছে বৈঠক। কেন? দেহটাকে সে একটু তাতিয়ে নিতে চায়! তার পরনে কেবল একটা কপনি!

হারাধনের ডন-বৈঠক দেওয়া শেষ হল। তারপর ঘরের কোণে গিয়ে সে একটা বোতল তুলে নিলে। তার ভিতরে ছিল রেড়ির তেল। সে বোতল কাত করে হাতে রেড়ির তেল ঢেলে সর্বাঙ্গে ভালো করে মাখতে লাগল! সে কি পাগলা হয়ে গিয়েছে? রাত একটার সময়ে কেউ কি গায়ে দুর্গন্ধ রেড়ির তেল মদন করে?

তেল-মাখা শেষ হল। এইবারে হারাধন আর দুটো জিনিস তুলে নিলে। মালার মতন জড়ানো একগাছ লম্বা নারিকেল-দড়ি এবং তার তৈলপক্ক মোটা বাঁশের খাটো লাঠিটা!

সে ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুললে। বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখলে। বাড়ি স্তব্ধ। কিন্তু তেতলায় ওঠবার সিঁড়িতে আলো জ্বলছে।

বারান্দায় বেরিয়ে সে এগিয়ে গেল পা টিপে টিপে। তেতলার সিঁড়ির কাছে এসে দেখলে, সিঁড়িতে ওঠবার পথ জুড়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে জনার্দন। সে হাসছে। জেগে নয়, ঘুমিয়ে। বোধহয় সুখস্বপ্ন দেখছে!

হারাধন দড়ি আর লাঠি মাটির উপরে রাখলে। তারপর ঝাপ খেলে জনার্দনের বক্ষদেশে। তারপর দুই হাতে তার গলাটা সজোরে চেপে ধরলে।

জনার্দনের হাসি মিলিয়ে গেল এবং সুখস্বপ্ন গেল ছুটে। সে জাগল দুই চোখ কপালে তুলে! বার-দুয়েক গো গো শব্দ করলে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল।

হারাধন দড়ি দিয়ে জনার্দনের হাত-পা আচ্ছা করে বেঁধে ফেললে। একবার এদিকেওদিকে তাকালে। না, গোঁ-গোঁ শব্দে কারুর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। সে দ্রুতপদে তেতলায় উঠে গেল।

মস্ত-বড়ো ছাদ–একসঙ্গে বসে তিনশো লোক পাত পাততে পারে। একেবারে ওদিকে, ছাদের শেষ-প্রান্তে আছে একখানা মাত্র ঘর। হারাধন নিঃশব্দে সেইদিকে ছুটল। বাহির থেকেই বোঝা গেল, সে ঘরের আলোও নেবানো হয়নি।

ঘরের দরজায় বাহির থেকে শিকল তোলা ছিল। দরজা তালাবন্ধ নেই দেখে সে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। শিকল নামিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

এককোণে বিছানা পাতা। বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে সুন্দর একটি শিশু। তার দুই গালে শুকনো অশ্রুর চিহ্ন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তার ওষ্ঠাধর এখনও ফুলে ফুলে উঠছে। হ্যা, এই তো বিমানকুমার!

শিশুকে ধরে দুই-একবার নাড়া দিতেই সে ভয়ে শিউরে জেগে উঠল, কাঁদবার উপক্রম করলে।

হারাধন তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত-চাপা দিয়ে নিম্নস্বরে বললে, চুপ, চুপ, কেঁদো না! বিমান, কোনও ভয় নেই, এই দ্যাখো আমি এসেছি!'

বিমানের দুই চোখে ফুটে উঠল গভীর বিস্ময়ের আভাস! সে বললে, নতুন দাদা?

—হ্যা ভাই, আমি তোমার নতুন দাদা!

—নতুন দাদা, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো!

—তোমাকে নিয়ে যেতেই তো এসেছি ভাই! কিন্তু শোনো। তুমি আর একটিও কথা বোলো না, তাহলে আর তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারব না। এসো, আমার কোলে ওঠো।

বিমানকে কোলে তুলে নিয়ে হারাধন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ছাদ পেরিয়ে সিঁড়ি বয়ে আবার নামল দোতলার বারান্দায়। জনার্দন তখনও পড়ে রয়েছে মড়ার মতো। তার ভির্মি ভাঙেনি।

দোতলা থেকে একতলায়। সেখানটায় ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। হারাধন আন্দাজে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হল।

অন্ধকারে হঠাৎ বাজখাই আওয়াজ জাগল–কোন হ্যায় রে?

দারোয়ান! এও বোঝা গেল, সে ছুটে আসছে। ছায়ামূর্তিটা অল্প অল্প দেখাও গেল। হারাধন তাড়াতাড়ি বিমানকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে।

তেলের মহিমায় মাছের চেয়েও পিচ্ছল! হারাধন এক ঝটকান মেরে দ্বারবানের বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে অত্যন্ত সহজেই। তারপর অন্ধকারেই চালালে দমাদম লাঠি! মারোয়াড়-নন্দন ষাড়ের মতন চেঁচিয়ে উঠল, বাপ রে বাপ, জান গিয়া! তারপরেই একটা ভারী দেহ-পতনের শব্দ!

দারোয়ান পপাত ধরণীতলে, কিন্তু চারিদিকে শোনা গেল দরজার পর দরজা খোলার দুমদাম শব্দ। চারিদিকে দ্রুত-পদধ্বনি! চারিদিকে জ্বলে উঠল আলোর পর আলো!

দলে দলে লোক নীচে ছুটে এসে দেখলে, দারোয়ান রক্তাক্ত মস্তকে উঠানে পড়ে ছটফট করছে এবং সদর দরজা খোলা!

বাবু দারোয়ানকে শুধোলেন, কী হয়েছে? কিন্তু দারোয়ান বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না!

এমন সময়ে তারাপদ ঝোড়ো কাকের মতো নীচে নেমে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, বাবু, বাবু! জনার্দনের হাত-পা বাঁধা, তেতলায় রতন রায়ের ছেলে নেই, দোতলায় হারাধনও নেই!

বাবুর গোঁফ ঝুলে পড়ল। তিনি বললেন, কেয়াবাৎ! 'তব বাক্য শুনি ইচ্ছি মরিবারে' ।

—হারামজাদাকে আমি দেখে নেব! তারাপদ সদরের দিকে পদচালনার চেষ্টা করলে। বাবু খপ করে তার হাত ধরে ফেলে বললেন, কোথা যাও?

—হারাধনকে ধরতে।

—অর্থাৎ নিজেও ধরা দিতে? বাপু, তুমি কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? রাস্তায় গোলমাল হলেই লাল-পাগড়ির আবির্ভাব হবে, তা কি জানো না? তারপর কেঁচো খুড়তে বেরুবে সাপ, এ বুদ্ধিটুকুও কি তোমার নেই?

তারাপদ পদচালনার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ দমন করে বললে, আমার যে নিজের হাত-পা কামড়াবার সাধ হচ্ছে!

বাবু গোঁফের উপরে আঙুল বুলিয়ে বললে, নিজের হাত-পা যত-খুশি কামড়াও, আমরা কেউ তোমাকে বাঁধা দেব না। কিন্তু ও-কাজটাও তোমাকে চটপট সংক্ষেপে সারতে হবে, কারণ আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই! এখনই পুলিশের টনক নড়বে, সকাল হবার আগেই আমাদের তল্পি-তল্পা গুছোতে হবে। বুঝেছ?

—হায় হায় হায় হায়! একটা পাড়াগেঁয়ে ভূতের হাতে শেষটা কিনা ঠকে মরতে হল!

—উহু, আমি বলি হারাধন হচ্ছে পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আর তুমি হচ্ছ শহুরে ভূত! এই বেনো-জলকে এখানে ঢুকিয়েছিল কে?

—আমিই বটে।

—প্রথম সন্দেহ হতেই ওর ভবলীলার পাল্লা সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ করে দিতে বলেছিলুম। তখন আপত্তি করেছিল কে?

—আমিই বটে।

—অতএব বাবাজি, এরপর থেকে আমি যা বলি কান পেতে শুনো।

—বলুন, কী বলতে চান?

—তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি। আমার বুদ্ধি কম হলে তোমার গোঁফও আমার চেয়ে লম্বা হত। বুঝেছ? এখন চলো, নেপথ্যে গিয়ে যবনিকাপাত করি!

হারাধনের ফাঁড়া এইখানেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু নিমরাজি হয়েও শেষটা কী ভেবে তারাপুদ বেঁকে দাঁড়াল, হঠাৎ মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল, না, না, এ হতেই পারে না, হতেই পারে না?

—কী হতে পারে না?

—হারাধনকে ছেড়ে দেওয়া!

—কেন হতে পারে না বাপু?

—বাবু, আমি ভেবে দেখলুম, হারাধনকে যদি ছেড়ে দি, তাহলে কেবল আমাদের দলই ভেঙে যাবে না, সেইসঙ্গে আমাদেরও চিরদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে!

—কিন্তু হারাধনকে ধরবে কেমন করে? সে কোন পথ দিয়ে চোঁচা দৌড় মেরেছে, আমরা কেউ তা জানি না!

তারাপদ বললে, বাবু, আপনি এত বড়ো বুদ্ধিমান হয়েও, বুঝতে পারছেন না যে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই!

এইবারে বাবুরও বুঝতে বিলম্ব হল না। মাথা নেড়ে ও গোঁফে তা দিয়ে তিনি বললেন, হুঁ, ঠিক! ছেলেটাকে নিয়ে হারাধন এখন সোজা ছুটবে রতন রায়ের বাড়ির দিকেই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রতন রায়ের বাড়িতে পৌছোতে গেলে টালিগঞ্জের রিজেন্ট পার্কের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। সেখানে আনাচে-কানাচে আমরা লুকিয়ে থাকব, তারপর হারাধন এলেই–হুঁহু, বুঝতে পারছেন? এত রাতে সেখানে জনমানব থাকবে না, সুতরাং–

সমূহ উত্তেজনায় বাবুর গোঁফজোড়া ফুলে উঠল। বাবুর গ্যারাজ বা গুদামে ছিল একখানা চোরাই মোটর, তৎক্ষণাৎ সেখানা বার করে আনা হল এবং তার উপর টপাটপ উঠে বসল কয়েকজন গুণ্ডার মতো লোক।

তারাপদ মুখে মুরুবিয়ানার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে, ঘুঘু, দেখি ধান খেয়ে তুমি কেমন করে পালাও! আমরা বাসা আগলে বসে থাকব। কেমন বাবু, ফন্দিটা কি মন্দ?

—না, মন্দ নয়। কিন্তু–

—আবার কিন্তু কেন বাবু?

হঠাৎ বাবুর মুখে ফুটল উদ্বেগের চিহ্ন। তার গোফজোড়া নেতিয়ে পড়তে চাইলে। কেমন যেন মনমরার মতো তিনি বললেন, তারাপদ, তারাপদ, আমার চোখ এমন নাচতে শুরু করলে কেন? এটা তো ভালো লক্ষণ নয়?

তারাপদ উৎসাহ দিয়ে বললে, কুছ পরোয়া নেহি! চোখ নাচছে শিকার ধরবার আনন্দে! এই চালাও গাড়ি! জয় মা কালী–কলকাত্তাওয়ালী।

দুমুখো ভূতের কাঁচা-পাকা হাসি

সেই ভয়াবহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিমানকে কাঁধে করে হারাধন রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

অন্ধকার রাস্তা, জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না, হারাধন ছুটছে দিগ্বিদিক-জ্ঞানহারার মতো। তার মনে জাগছে কেবল এক কথাই– পিশাচদের কবল থেকে যেমন করে হোক বিমানকে রক্ষা করতেই হবে, নিজের প্রাণ যায় তাও স্বীকার!

এইভাবে বেশ খানিকটা পথ পার হয়ে সে যখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কোনও বিভীষিকার ছায়া পর্যন্ত নেই, তখন বিমানকে কাঁধ থেকে নামিয়ে একটিবার দাঁড়িয়ে পড়ল হাঁপ ছাড়বার জন্যে।

তখন তারা এসে পড়েছে চৌরঙ্গিতে গড়ের মাঠের ধারে। দপদপে আলোগুলো তখন চোখ মুদে অন্ধকারকে পথ ছেড়ে দেয়নি বটে, কিন্তু কোথাও নেই বিপুল জনতার চিহ্ন, মোটর ট্রাম বাসের ধূমধড়াক্কা ও হরেক রকম হট্টগোলের শব্দ-এ যেন এক অবিশ্বাস্য নতুন চৌরঙ্গি!

একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সার বেঁধে আকাশের দিকে মাথা তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে যেন প্রেতপুরীর পর প্রেতপুরী; এবং আর একদিকে দূরবিস্তৃত গড়ের মাঠ তার গাছপালা ঝোপঝাপ নিয়ে আলোকরাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছে প্রথমে আবছায়া ও তারপর অন্ধকারের অন্তরালে। কোনওখানেই নেই জনপ্রাণীর সাড়া, চারিদিক এত স্তব্ধ যে শোনা যায় নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ। হারাধনের মনে হতে লাগল সে যেন কোনও মৃত শহরের মাঝখানে এসে পড়েছে!

পাহারাওয়ালাদের লালপাগড়িগুলোও তখন রাস্তার উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, নইলে এমন অসময়ে হারাধনের তেল-চকচকে কপনি-পরা দেহ

দেখলে নিশ্চয়ই লাঠি ঘুরিয়ে তেড়ে আসত। কিন্তু এখন তার পাহারাওয়ালার হাতে গ্রেপ্তার হতে কোনও ভয়ই নেই– কারণ সেটা হবে শাপে বরের মতো! লালপাগড়ির পাল্লায় পড়লে জমিদারবাবুর চালাচামুণ্ডারা আর তাকে ধরতে পারবে না! মারাত্মক রোগযন্ত্রণায় কাতর রোগীরা যেমন যমকেও স্মরণ করে, হারাধনও তখন মনে মনে ডাকতে লাগল–হে লালপাগড়ি, দয়া করে একটিবার তুমি দেখা দাও! কিন্তু মিছেই ডাকাডাকি, হারাধন তো খাস কলকাতার ছেলে নয়, কাজেই সে জানে না যে, দরকারের সময়ে লালপাগড়িরা কোনওদিনই খবরদারি করতে আসে না! হারাধন জানত, চৌরঙ্গির রাস্তা ধরে সিধে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হলে টালিগঞ্জে গিয়ে পড়া যায়। তারপর ট্রামওয়ে টার্মিনাস পার হয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরে মাইল দেড়েক গেলেই রতন রায়ের বাড়ি পাওয়া যাবে।

সে বললে, বিমান, এইবারে তুমি পিঠে চড়ে দুইহাত দিয়ে আমাকে ভালো করে জড়িয়ে থাকো! কিন্তু দেখো, যদি কোনও হাঙ্গামা হয়, তুমি যেন ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে না।

বিমান হাসিমুখে বললে, আচ্ছা।

—হ্যাঁ, কিছুতেই হাত ছেড়ে পিঠ থেকে নেমে পড়বেন! যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ তোমার কোনও ভয় নেই।

বিমানের হাসিমুখ দেখেই বোঝা গেল, নতুনদাদাকে পেয়ে সেসব ভয়ভাবনাই ভুলে গিয়েছে! নিস্তব্ধ রাত্রে চৌরঙ্গির এমন আশ্চর্য নির্জনতাও সে কখনও চোখে দেখেনি এবং মানুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে এমন ছুটোছুটি খেলাও আর কোনওদিন খেলেনি, কাজেই তার কাছে সমস্তটাই খুব মজার ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল।

বিমানকে পিঠে তুলে নিয়ে হারাধন আবার ছুটতে শুরু করলে জোরকদমে। তারা যখন গড়ের মাঠের শেষ প্রান্তে বড়ো গির্জার কাছে এসে পড়েছে তখন আবার আর এক কাণ্ড!

একটা লালমুখো গোরা বেধড়ক মদ খেয়ে ফুটপাতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ঝিমোতে ঝিমোতে নেশার স্বপন দেখছিল। আচমকা দ্রুতপদশব্দ শুনে চোখ মেলে দেখে, একটা তেলচকচকে ন্যাংটা কালা আদমি ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে– কী আশ্চর্য, তার দেহের উপর দুই-দুইটা মুণ্ড! নিশ্চয়ই ভূত দেখেছে ভেবে সে আর্তনাদ করে দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললে!

মাতাল গোরাটার রকম-সকম দেখে এত বিপদেও হারাধন হো হো করে না হেসে থাকতে পারলে না এবং তার সঙ্গে কচি গলায় খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল বিমানও!

এইবারে গোরাটার নাড়ি ছেড়ে যাবার জো আর কী! বাপ রে, এই দুমুখো ভূতটা আবার একসঙ্গে দু-রকম গলায় হাসতেও পারে! পাছে সেই অসম্ভব চেহারাটা আবার স্বচক্ষে দেখতে হয় সেই ভয়ে আরও জোরে প্রাণপণে চোখ মুদে গোরাটা কান্নার সুরে ইংরেজিতে যা বললে, বাংলায় তার মানে দাঁড়ায় এইঃ হে আমার ভগবান, এই দুমুখো ভূতের খপ্পর থেকে আমাকে রক্ষা করো?

হারাধন হাসতে হাসতে আবার নিজের পথ ধরলে। যদিও ব্যাপারটা আরও কতদূর গড়ায় সেটা দেখবার তার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন তো মজা দেখবার সময় নেই!

এল ভবানীপুর, এল কালীঘাট, এল রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়। তারপর টালিগঞ্জের পোল পেরিয়ে, ট্রামওয়ে টার্মিনাস পিছনে রেখে রিজেন্ট পর্কে যাবার রাস্তা।

শেষরাতে মানুষদের ঘুম আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে, মাথার উপরে জেগে আছে খালি উড়ন্ত প্যাঁচা আর বাদুড়রা। এখানে চৌরঙ্গির মতো বিদ্যুৎবাতির মালা নেই, মাঝে মাঝে ঘুটঘুটে অন্ধকারকে ছাদা করে জ্বলছে এক একটা মিটমিটে আলো। অন্ধকার দূর হয় না, আলো দেখা যায় নামমাত্র। পথের এপাশে-ওপাশে

আবছায়া মেখে দাঁড়িয়ে আছে গাছের পর গাছ, তাদের পাতায় পাতায় থেকে থেকে বাতাসের শিউরে ওঠার শব্দ।

সেইখানে পথের একধারে রাত-আঁধারে কালো গা মিলিয়ে অপেক্ষা করছে একখানা মোটরগাড়ি। তার ভিতরে কোনও আরোহি নেই, কিন্তু তার আড়ালে রাস্তার উপরে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে কতকগুলো ছায়ামূর্তি। শিকারী হিত্রে জন্তুর মতো তাদের হাবভাব।

সিগারেট ধরাবার জন্যে ফস করে কে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বললে, অল্পক্ষণের জন্যে দেখা গেল জাল জমিদারবাবু কাঁকড়াদাড়া গোঁফ।

তারাপদ ফিসফিস করে বলে উঠল, ও বাবু, করেন কী, করেন কী?

শুয়োরের মতো ঘোৎ-ঘোৎ করে বাবু বললেন, কী আবার করব, সিগারেট ধরালুম দেখতে পাচ্ছ না?

—আমি তো দেখছি, যদি আরও কেউ দেখে ফেলে?

—এখানে আর কে দেখবে? ঝিঝিপোকা? কোলাব্যাঙ? না বুনো মশা?

—না বাবু, সাবধানের মার নেই।

মহা ক্রোধে আর উত্তেজনায় বাবুর মস্তবড়ো ভুঁড়িটা একবার ফুলে উঠতে ও আর একবার চুপসে যেতে লাগল। জ্বলন্ত চক্ষে তিনি বললেন, চুপ করে থাকো! কাকে সাবধান হতে বলছ? এতদিন তোমরা কতটা সাবধান হয়ে ছিলে? তোমরা যদি সাবধান হতে পারতে তাহলে আজ–উঃ, বাপ রে বাপ! কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন!

—কী হল বাবু, কী হল?

—যা হবার তাই হল! একটা বোম্বাই মশা আমার নাকের ডগায় কামড়ে দিয়েছে! খালি কি নাক? আমার গোটা মুখখানা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছ কি?

আর একটা লোক অতিযোগ করে বললে, বাবু, এখানটা হচ্ছে মশার ডিপো, আমরা আর.সহ্য করতে পারছি না!

রাগে গসগস করতে করতে ও নাকের ডগায় হাত বুলোতে বুলোতে বাবু বললেন, তারাপদর অসাবধানতার জন্যেই সকলের আজ এই দুর্দশা। তারাপদ আবার আমাদের সাবধান হতে বলছে! না, আমরা আর সাবধান হব না! বেশ বোঝা যাচ্ছে, হারাধন-বেটা ছোড়াটাকে নিয়ে অন্য কোনওদিকে পিঠটান দিয়েছে–ইস, ইস, ইস। বাবু লম্ফ ত্যাগ করে ঘন ঘন পা ঝাড়তে লাগলেন!

—আবার কিছু হল নাকি বাবু?

—হল না তো কী? নিশ্চয় বিছে কী সাপের বাচ্চা! পা বেয়ে সড়সড় করে উপরে উঠছিল! চলো হে, এখান থেকে সবাই মানে মানে সরে পড়া যাক–আজ আর কেউ আসবে না!

তারাপদ বললে, বাবু, আর একটু সবুর করুন!

বাবু নাচারভাবে বসে পড়ে বললেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি তারাপদ, আজকের গতিক সুবিধের নয়?

—চুপ, চুপ! চেয়ে দেখুন!

বাবু সচমকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিচালনা করলেন। দূরে ল্যাম্পপোস্টের তলায় চকিতের জন্যে দেখা গেল একটা ছুটন্ত মূর্তি। তারপরই শোনা গেল কার দ্রুত পায়ের শব্দ। কে দৌড়তে দৌড়তে এদিকেই আসছে।

তারাপদ বললে, নিশ্চয় হারাধন!

বাবু বললেন, খুব হুঁশিয়ার! বেটা অনেক কষ্ট দিয়েছে, আবার যেন চোখে ধুলো না দেয়! চারিদিক থেকে ওর উপরে লাফিয়ে পড়ো–ওকে একেবারে শেষ করে ফ্যালো, তারপর রতন রায়ের ব্যাটাকে গাড়িতে এনে তোলো!

যমদূতের মতো লোকগুলো ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল এবং প্রত্যেকেরই হাতে চকচকিয়ে উঠল এক-একখানা শাণিত ছোরা!

সকলের আগে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল তারাপদ–তার চোখে-মুখে বীভৎস হিংসার ছাপ!

দৌড়ে আসছিল হারাধনই বটে। কিন্তু তারাপদ তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলে না–সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিজের পৃষ্ঠদেশে লম্বমান বিমানের কানে ফিসফিস করে বললে, খোকন, তোমার কোনও ভয় নেই! তুমি চোখ মুদে ফ্যালো, তারপর আরও জোরে আমাকে জড়িয়ে ধরো!

তারাপদ তখন তার উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। মোটা বাঁশের লোহাবাঁধানো খাটো লাঠিটা তখনও হারাধনের হাতে ছিল। তড়িৎবেগে তার হাত উঠল শূন্যে এবং ভারী লাঠিগাছা সবেগে ও সজোরে নিক্ষিপ্ত হল তারাপদর দিকে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য! বিকট আর্তনাদে আকাশ ফাটিয়ে তারাপদ তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে মাথাকাটা পাঠার মতো ছটফট করতে লাগল–লৌহমণ্ডিত লাঠির অগ্রভাগটা প্রচণ্ড বেগে গিয়ে পড়েছে তার চোখের উপরে!

এই আকস্মিক ও অভাবিত বিপর্যয়ে আততায়ীরা দাঁড়িয়ে পড়ল স্তম্ভিতের মতো এবং হারাধনও ত্যাগ করলে না তাদের সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগ–পরমুহূর্তেই পাশের দিকে লাফিয়ে পড়ে তড়বড় করে একটা উঁচু গাছের উপরে উঠতে লাগল! পাড়াগেঁয়ে ছেলে, শিশুকাল থেকেই গাছে চড়তে ওস্তাদ, সকলের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ল অবিলম্বেই। তারাপদর ষণ্ডাকণ্ঠের গণ্ডগোলে ভেঙে গেল দুই পাহারাওয়ালার চটকা! আর্তনাদের উৎপত্তি কোথায় জানবার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে।

কিন্তু বাবু সে সম্ভাবনা আমলেই আনলেন না, চণ্ডালে-রাগে আত্মহারা হয়ে তিনি বলে উঠলেন, তোরাও গাছে চড়, পাড়াগেঁয়ে শয়তানটাকে ধরে মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দে- কেটে কুটি-কুটি করে ফ্যাল–আজ এসপার কী ওসপার!

গাছের টঙে উঠে হারাধনও গলা ছেড়ে চ্যাঁচাতে লাগল–খুন, খুন! ডাকাত! কে কোথায় আছ দৌড়ে এসো! খুন! ডাকাত!

তারাপদর ভয়ঙ্কর আর্তনাদেই সেখানকার অনেকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, এখন আবার হারাধনের বলিষ্ঠ কণ্ঠের গোলমাল জাগিয়ে তুললে গোটা অঞ্চলটাকেই।

এই হট্টগোলের নিশ্চিত পরিণাম বুঝে বাবুর সাঙ্গপাঙ্গর হারাধনকে বধ করবার জন্যে গাছে চড়বার প্রস্তাব কানেই তুললে না। তারা মোটরকারের দিকে দৌড়ে গেল হস্তদন্তের মতো। কিন্তু বিপদকালে গাড়িখানাও ত্যাগ করলে তাদের পক্ষ–সে স্টার্ট নিতে রাজি হল না!

প্রথমেই শোনা গেল ধাবমান পাহারাওলাদের পায়ের শব্দ। ষণ্ডামার্কার দল তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারলে দৌড় মারলে। কিন্তু ফল হল না, তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে জাগ্রত বাসিন্দাদের বেড়াজাল। সর্বাগ্রে পেটমোটা কঁকড়া-গুঁফো জাল জমিদার, তারপর একে একে প্রত্যেক বদমাইশ ধরা পড়তে বিলম্ব হল না।

তখন বৃক্ষশাখা ত্যাগ করে মাটির উপরে অবতীর্ণ হল একসঙ্গে ডবল মূর্তি। প্রশ্ন হল, কে তোমরা, কে তোমরা?

—আমি হারাধন।

—'আমি বিমান?

হারাধন বললে, ওরা আমাদের খুন করতে এসেছিল।

বিমান বললে, আমি বাড়িতে যাব!

পাহারাওয়ালা বললে, না, তোমরা এখন থানায় যাবে।

বিমান চকোলেট খেতে দেবে

তারা থানায় গিয়ে হাজির হল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত হারাধন ও বিমানকে বসিয়ে রাখা হল একটা ঘরে। নতুন দাদার তৈলাক্ত কোলের উপরে শুয়ে বিমানও বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিতে আপত্তি করলে না।

সকালবেলায় হারাধনের কপনি-পরা তৈলাক্ত চেহারা দেখে ইনস্পেকটারবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে বাপু?

—আজ্ঞে, হারাধন পাল।

—তোমার সঙ্গের ও-খোকাটি কে?

—ব্যারিস্টার মিঃ রতন রায়ের ছেলে।

—কী বললে? মিঃ রতন রায়ের ছেলে? ওকে তুমি কোথায় পেলে?

—জমিদারবাবুর বাড়িতে।

—কে জমিদারবাবু?

—তাহলে সব কথা খুলে বলি শুনুন।

হারাধন গোড়া থেকে আরম্ভ করে নিজের সমস্ত কাহিনি বর্ণনা করে গেল, কিছুই লুকোলে না। শুনতে শুনতে ইনস্পেকটারবাবুর মুখের উপরে নানাভাবের রেখা ফুটে উঠতে লাগল।

হারাধনের আত্মকাহিনি সমাপ্ত হলে পর ইনস্পেকটারবাবু উচ্ছসিত স্বরে বললেন, হারাধন, কী বলে তোমার প্রশংসা করব জানি না, যেখানে তোমার মতন ছেলে থাকে, সে পাড়াগাঁ হচ্ছে কলকাতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ! তুমি হচ্ছ দেশের সুসন্তান! একটু অপেক্ষা করো, আমি ফোনে মিঃ রায়কে সুখবরটা দিয়ে আসছি।

ইনস্পেকটারবাবু পাশের ঘরে চলে গেলেন।

হারাধন ডাকলে, বিমান!

—কী নতুন দাদা?

—তোমার ভয় করছে?

—উহু!

—কেন ভয় করছে না?

—তুমি যে কাছে রয়েছ!

—তুমি আমাকে এত ভালোবাসে?

—হুঁ, খুব–খুব ভালোবাসি!

—তোমার খিদে পেয়েছে?

—না।

—কেন খিদে পায়নি?

—বাবা আর মাকে না দেখলে আমার খিদে পাবে না!

—তোমার বাবা এখনই এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন।

—তুমিও আমার সঙ্গে যাবে তো?

—না ভাই, আমি যাব অন্য জায়গায়।

—ইস, তাই বইকী! আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাব।

—-ছিঃ ভাই, কারুকে কি ধরে নিয়ে যেতে আছে? এই দ্যাখো না, তোমাকে দুষ্টু লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে তোমার কত কষ্ট হচ্ছে!

—দূর, আমি কি তোমাকে ওই-রকম ধরে নিয়ে যাব?

—তবে?

—আমি তোমাকে আদর করে ধরে নিয়ে যাব।

—ধরে নিয়ে গিয়ে কী করবে?

—তোমার সঙ্গে খেলা করব।

—আমার যখন খিদে পাবে?

—চকোলেট, টফি, লজেঞ্জুস, বিস্কুট খেতে দেব।

—তাহলে তো দেখছি আর আমার কোনও ভাবনাই নেই!

—এমন সময়ে ইনস্পেকটারবাবু ফোন করে ফিরে এসে বললেন, মিঃ রায় এখনই থানায় আসছেন।

—হারাধন ব্যস্ত হয়ে বললে, এই কপনি পরে তেলমাখা গায়ে কেমন করে আমি তার সঙ্গে দেখা করব?

ইনস্পেকটারবাবু হেসে বললেন, ভয় নেই হারাধন, এখনই তোমাকে সাবান, তোয়ালে আর শুকনো কাপড় দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

হারাধন তাড়াতাড়ি সাবান মেখে স্নান করে শুকনো কাপড় পরে নিলে। তারপর মিঃ রায় এলেন। গাড়িতে কেবল তিনি নন, তার স্ত্রী প্রতিমা ও তার মেয়ে প্রীতিকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন।

বিমান দৌড়ে গিয়ে একেবারে বাবার কোল অধিকার করলে। মিঃ রায় হারাধনের মাথার উপরে একখানি হাত রেখে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, বাবা হারাধন, তুমি গেল-জন্মে আমার কে ছিলে জানি না, কিন্তু যে উপকারটা করলে এ-জীবনে আর তা ভুলব না।

প্রতিমা তার দুটি হাত ধরে বললেন, প্রীতিকেও তুমি বাঁচিয়েছ, বিমানকেও তুমি বাঁচালে। এবার থেকে ওদের আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম। কেমন বাবা, এ ভারটি নিতে পারবে তো?

হারাধন বললে, মা, পারলে এ ভারটি নিশ্চয়ই নিতুম। কিন্তু আমি যে আজকেই দেশে চলে যাচ্ছি।

মিঃ রায় সবিস্ময়ে বললেন, সে কী, এর মধ্যেই তোমার কলকাতা দেখার শখ মিটে গেল?

—হ্যা বাবা। আমাদের মতো পাড়াগেঁয়েদের জন্যে কলকাতা শহর তৈরি হয়নি। কলকাতার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাইতেই বুঝে নিয়েছি যে, আমাদের পক্ষে পাড়াগাঁই ভালো। কলকাতা যতই সুন্দর হোক, তাকে আমার সহ্য হবে না।

প্রীতি এগিয়ে এসে হারাধনের হাত চেপে ধরে বললে, ইস, তোমাকে যেতে দিলে তো যাবে!

হারাধন বললে, না বোন, আমাকে যেতে হবেই। কলকাতায় থাকতে আমার ভয় হচ্ছে, এখানকার মানুষরা ভয়ানক।

মিঃ রায় বললেন, না হারাধন, যতটা ভাবছ কলকাতা ততটা খারাপ নয়। এখানকার অন্ধকারটাই আগে তোমার চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু কিছুদিন এখানে থাকলে কলকাতার আলোও তোমার চোখে পড়বে। আমাদের কলকাতা হচ্ছে বহুরূপী, যে যেমন চায় সে তার কাছে সেই রূপেই ধরা দেয়। কলকাতাকে

দেখবার জন্যে তুমি ভুল পথ বেছে নিয়েছিলে, তাই বিপদেও পড়েছ। আমার কাছে থাকলে তুমি দেখবে এক নতুন কলকাতাকে।

হারাধন বললে, বাবা, আপনি আমাকে ভালোবাসেন বটে, কিন্তু আমি আপনার গলগ্রহ হতে চাই না।

—না, না হারাধন, এ তোমার ভুল বিশ্বাস। আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতোই দেখব। আমি দেখেছি তোমার ভিতরে আগুন আছে। ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়ে আমি তোমার ভিতরকার আগুন আরও উজ্জ্বল করে তুলতে চাই–তুমি হবে দেশের এক উজ্জ্বল রত্ন!

—কিন্তু আমার বাবা মত দেবেন কি?

—তোমার বাবাকে রাজি করবার ভার নিলুম আমি নিজেই...হ্যাঁ, ভালো কথা। আমার কাছে তোমার একটি পাওনা আছে।

—আমার পাওনা আছে?

—হাঁ, একখানি পাঁচ হাজার টাকার চেক, বিমানকে উদ্ধার করবার জন্যে পুরস্কার। চেক আমি লিখেই নিয়ে এসেছি। এই নাও। মিঃ রায় পকেট-বুকের ভিতর থেকে চেকখানি বার করলেন।

জোরে মাথা-নাড়া দিয়ে হারাধন বললে, না, না! পুরস্কারের লোভে আমি বিমানকে উদ্ধার করিনি?

—এ কথা আমি জানি হারাধন, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু চেকখানি তোমাকে নিতেই হবে, আমারও অঙ্গীকারের একটা মূল্য আছে তো?

—ও টাকা আমি কিছুতেই নেব না! আপনি বরং ওই টাকাটা আমার নামে কোনও হাসপাতালে দান করবেন।

মিঃ রায় প্রগাঢ় স্বরে বললেন, হারাধন, তোমাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি! বেশ, আমি এই পাঁচ হাজার টাকা তোমার নামে কোনও হাসপাতালেই

পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তোমার একটা কথা আমি কোনওমতেই শুনব না। তোমাকে এখনই আমার সঙ্গেই যেতে হবে।

প্রীতি ও বিমান দুই দিক থেকে হারাধনের দুই হাত ধরে টানতে টানতে বললে, আমাদের সঙ্গে চলো নতুন দাদা, আমাদের সঙ্গে চলো!

হারাধন বিব্রত হয়ে বললে, ও দিদি, ও দাদা, আর টানাটানি কোরো না, আমি তোমাদেরই সঙ্গে যাব!

বিমান নৃত্য শুরু করে দিয়ে বললে, নতুন দাদা সঙ্গে যাবে–নতুন দাদা সঙ্গে যাবে! কী মজা ভাই, কী মজা!

ইনস্পেকটারবাবু এতক্ষণ চুপ করে সব দেখছিলেন ও শুনছিলেন। এখন তিনি বললেন, হারাধন, তোমার গুণ দেখে আমিও মুগ্ধ হয়েছি। তুমিও মাঝে মাঝে আমার কাছে এলে খুব খুশি হব।

বিমান সভয়ে বললে, না, আমার নতুন দাদা আর এখানে আসবে না। এখানে একটা ঘরে সেই রাক্কসের মতো লোকটা আছে!

ইনস্পেকটার হেসে বললেন, ও, তুমি বুঝি সেই জাল জমিদারের কথা বলছ? না খোকা, সে আর কোনও নষ্টামিই করতে পারবে না! এখন তাকে হাজতে পোরা হয়েছে, এরপর যাবে জেলখানায়।

হারাধন শুধোলে, তারাপদবাবু কোথায়?

—তোমার ডাণ্ডা খেয়ে এখন হাসপাতালে। তার একটা চোখ একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেরে উঠলে একটিমাত্র চোখ নিয়ে তাকেও বেড়াতে যেতে হবে জেলখানায়।

কাঁচুমাচু মুখে হারাধন বললে, লাঠিটা যে চোখে গিয়ে পড়বে তা আমি জানতুম না!

মিঃ রায় বললেন, লাঠিটা তার চোখে গিয়ে পড়েছে ভগবানের ইচ্ছায়। শয়তানির শাস্তি! এখন আর কথায় কথায় সময় কাটানো নয়, সবাই বাড়ির দিকে চলো–এসো বিমান, তোমার নতুন দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

সমাপ্ত